Vol. 38 | No. 3 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান

Volume	38
Issue	3
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ কবির
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i3.4
Pages	103-134
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ৩

Check for updates

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান

আহমদ কবির

অভিধান প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যবহারিক। তাই সব অভিধানই ব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয়। তবু এখানে ব্যবহারিক অভিধান বলতে সেগুলিকেই আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যা প্রধানত বাংলা শব্দের চলমান রূপের পরিচায়ক। এই শ্রেণির অভিধানের মধ্যে রাজশেখর বসুর *চলন্তিকা*, কাজী আবদুল ওদুদের *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* উল্লেখযোগ্য। এই অভিধানসমূহের তুলনামূলক পরিচয় দান বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য।

অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অভিধান বা শব্দকোষ প্রণীত হয় ব্যবহার করার জন্যই এবং লোকে যে এটি ঘরে রাখে তা ব্যবহারের প্রয়োজনেই। অভিধান ঘরের শোভাবর্ধনকারী কোনো বস্তু নয়, যদিও কখনো কখনো দেখা যায় বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ব্যক্তিও ড্রয়িংরুমের মূল্য বাড়ানোর জন্য দুই চারটা বইয়ের সঙ্গে অভিধানও সাজিয়ে রাখে। সেটি অবশ্য সংস্কৃতি প্রদর্শনের পরিচয়, চর্চার নয়। বই কেনার ব্যাপারে বাঙালির দুর্নাম আছে। বাঙালি অভিধানমনস্ক জাতি নয়। বাঙালি যেখানে সহজে বই কেনে না সেখানে অকাতরে অভিধান কিনবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। তবু গরজে পড়ে এবং ভালোবেসেও বাঙালি সবকিছু করে; অভিধানও কেনে। শিক্ষার্থীরা, জ্ঞানব্রতীরা, শিক্ষকেরা, গবেষকেরা, সংবাদপত্রসেবীরা, সাহিত্যপাঠকেরা, লিখিয়েরা অভিধান কিনে থাকেন এবং তাঁরা অভিধান নাড়াচাড়াও করে থাকেন। অর্থাৎ তাঁরা অভিধান ব্যবহার করেন। এঁরা সবাই ভাষার কারবারী, সুতরাং অভিধানের প্রয়োজন তাঁদের হবেই। একটি দেশে এই শ্রেণির মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চাও তত বাড়বে, ততই অভিধান ব্যবহারের এলাকাও সম্প্রসারিত হবে।

ভাষার ব্যবহারকারীদের কারো কারো জ্ঞানগত বিশেষ মর্যাদাবোধও থাকে। কাউকে গর্বভরে বলতে শোনা যায়, আমি আমার বাবার কাছ থেকে আর তো কিছুই পাইনি, শুধু এই অভিধানটি পেয়েছিলাম, বাবাও পেয়েছেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। অর্থাৎ ইনি জানিয়ে দিতে চান যে, ইনি মোটেও ভুঁইফোঁড় নন, এর পরিবারেও পুরুষানুক্রমে বিদ্যাচর্চার ঐতিহ্য আছে এবং সেই ঐতিহ্যের মধ্যে অভিধানও রয়েছে। উপনিবেশের আমলে ইংরেজির দাপটের যুগে, এমনকি পাকিস্তানি আমলেও *অক্সফোর্ড চেম্বার্স* ইত্যাদি ডিক্‌শনারি ঘরে আছে বলে অনেকে শ্লাঘা বোধ করতেন। *এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা* জাতীয় কয়েক খণ্ডবিশিষ্ট বৃহৎ বিশ্বকোষগ্রন্থ কেনার সামর্থ্য সকলের যেমন সে কালেও ছিল না, একালেও তেমনি নেই। এগুলো কিনতে পারে বিত্তবান সংস্কৃতিসেবীরা। এ-জাতীয় কোষগ্রন্থ ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। এগুলো ব্যবহারের আগ্রহ সকলের যে আছে তাও নয়, তবু যাদের আছে তাদের ধার নিতে হয় অন্যের কাছ থেকে নতুবা যেতে হয় একাডেমিতে, মিউজিয়ামে, আর্কাইভ্‌সে, ব্রিটিশ কাউন্সিলে, গণপাঠাগারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে, অর্থাৎ বিদ্যাচর্চার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

জ্ঞানকোষ ও শব্দকোষ যে এক পদার্থ নয় সেটি অবশ্য স্বীকার্য। জ্ঞানকোষ দিয়ে শব্দকোষের কাজ হয় না, আর শব্দকোষেও জ্ঞানকোষের প্রয়োজন সারানো যায় না, যদিও দেখা যায় কোনো কোনো বৃহৎ অভিধান কখনো কখনো জ্ঞানকোষের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। মানববিদ্যার গভীরতর তথ্য ও তত্ত্বের, জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের, বিশ্বইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির, ভৌগোলিক স্থান পরিচয়ের,

খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকের, বিশ্বব্যক্তিত্ব ও মহাজনদের ভুক্তি কোনো কোনো বড় অভিধানে দেখা যায়। সুতরাং এ দিক থেকে অভিধান জ্ঞানকোষও।

অভিধানপ্রণয়ন একটি কঠিন কর্ম, পরিশ্রমপূর্ণ ও সময়সাপেক্ষ কাজ। হাজার হাজার শব্দের বর্ণানুক্রমিক ভুক্তি, সেগুলোর পদপরিচয়, ব্যুৎপত্তি, অর্থ, নানার্থ, সমার্থ, বিপরীতার্থ, পদপরিবর্তন, লিঙ্গপরিবর্তন, উচ্চারণ, বানান, প্রয়োগরূপ ইত্যাদি কত দিকেই না অভিধানের কাজ। এটা পণ্ডিতী কাজ, যদিও ভাষার অন্ধিসন্ধি কিছুই জানেন না এবং শব্দের উৎস বা ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভাষাজ্ঞান ও ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান কিছুই রাখেন না এমন অপণ্ডিতেও যে অভিধান লিখেছেন তার উদাহরণও রয়েছে। বাজারে চালু চার পাঁচটা অভিধানের ভুক্তি থেকে টুকে নিয়ে এবং নতুন কিছু শব্দ যোজনা করে একটা অভিধান খাড়া করা যায়। এ-রকম অভিধান কেজো হতে পারে, কিন্তু মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। নতুন অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুবিধা এই যে, পূর্ব-প্রণীত অভিধানের শব্দসংখ্যার হিসাব জানা থাকে। অভিধান একবার বাজারে বেরিয়ে গেলে তার মধ্যে কোথায় বিচ্যুতি কোথায় অপূর্ণতা তা বুঝে নিতে পরবর্তী প্রণয়নকারীর সুবিধা হয় এবং সে অনুযায়ী তিনি তাঁর অভিধানকে উন্নত একটি রূপও দিতে পারেন। একজনের পক্ষে একটা অভিধান লেখাও বেজায় পরিশ্রমের কাজ। ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও দায়িত্বচেতনা না থাকলে অভিধান রচনায় স্বতঃপ্রণোদিত হবার কারণ নেই। হরিচরণ বা জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মতো পুরো জীবন ব্যয় করবে এমন নিষ্ঠাবান অভিধানসাধক তো সব সময় পাওয়া যায় না। এঁরা অবশ্য শ্রদ্ধেয় অভিধানকার। বাংলা অভিধানে জনসন ওয়েবেস্টার পেতে চাইলে এঁদের নাম মনে আসবে। একালে অভিধান প্রণয়ন অনেকাংশে যৌথ কর্ম। একজন প্রধান সম্পাদক হয়তো থাকেন, কিন্তু তাঁকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন সহকর্মীও থাকেন। অর্থাৎ পুরো একটি দল অভিধানের পিছনে কাজ করে। ভাষার উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত সরকারি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে যে-সব অভিধান বের হয় সেগুলো এ-রীতিতেই। অর্থাৎ লোকজন লাগিয়ে দিয়ে অভিধান করা। এই লোকজনের ভিতরে অবশ্য যোগ্য লোকও থাকেন, কিন্তু যে-রীতিতে এ-অভিধান প্রণীত হয় তার কথা মনে রেখে যোগ্য লোককেও সবিনয় স্পষ্ট উক্তি করতে হয়, "যোগ্যতা বলে নয়, নিযুক্তি সূত্রেই আমি এ-অভিধান সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করি" [আহমদ শরীফ ১৯৯২]।

অভিধান-সংকলনের ইতিহাস মোটেও অর্বাচীন নয়। যে-ভাষার প্রয়োগের বা ব্যবহারের সীমা সম্প্রসারিত এবং যে-ভাষার রয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্য সে-ভাষার অভিধান প্রণীত হয়েছে। গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, পালি, ফারসি, আরবি ইত্যাদি সব প্রাচীন ভাষাতে অভিধান কিংবা অভিধানজাতীয় শব্দকোষ আছে। সংস্কৃত *অমরকোষের* খ্যাতি নামেই প্রতিষ্ঠিত; অমরসিংহের নাম কেইবা মনে রেখেছে।

আধুনিক কালে, ইংরেজির শাসনে ছিলাম বলে ইংরেজি অভিধান সম্বন্ধে আমরা যেমন অবহিত, ইউরোপীয় বা এশীয় ভাষাগুলোর অভিধান সম্বন্ধে তেমনই অনবহিত। ফরাসি, জার্মান, রুশ, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, জাপানি, চীনা, কোরিয়ান ইত্যাদি আধুনিক ভাষাগুলোতে উল্লেখযোগ্য অভিধান যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রত্যেক জীবন্ত ভাষারই অভিধান থাকবে। অভিধান ভাষার শব্দরাজ্য। বলা হয়, ভাষা হচ্ছে স্রোতবাহী নদী, ঠিক সিধে চলে না, বেঁকেচুরে যায় এবং এইভাবে ভাষার আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। জীবন্ত ভাষার রূপ পরিবর্তনে মৌখিক ভঙ্গির প্রভাব থাকে, এটি ধরা পড়ে বাক্যের অঙ্গসংগঠনে, শব্দের উচ্চারণে, বানানের রীতি বদলে। বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও বিনিময়, এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ভাষার অঙ্গরূপে আনে অভিনবত্ব এবং এ-ভাবে ভাষার প্রয়োগবৈচিত্র্য ও ব্যবহার উপযোগিতা বেড়ে যায়। চলমান জীবনের কত প্রকাশ, কত কথা, কত শব্দ। অভিধানে শব্দ থাকে ঘুমিয়ে। প্রয়োগের পৌনঃপুনিকতাই ঐ শব্দগুলোর জাগ্রত সত্তা ও উপযোগিতা। ব্যবহারিক উপযোগিতাহীন শব্দ স্থিরবদ্ধ, নিশ্চল, মৃত। ব্যবহার না হতে হতে অনেক শব্দ স্মৃতিতেও লুপ্ত হয়ে যায়। আবার কবি-সাহিত্যিকেরা ভাষার শব্দভাণ্ডার ভরিয়ে তোলেন, নতুন শব্দ তৈরি করেন। এ-ক্ষেত্রে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কিংবা সুধীন্দ্রনাথের উদাহরণ বাহুল্য মাত্র। শব্দ-তৈরিতে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা এই রকম:

> বাংলা ভাষায় গদ্য লিখতে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধরে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি সেই উপলক্ষে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে উঠে, মূলে যেটা অসংগত, অভ্যাসে সেটা সংগতি লাভ করে[১]।

এ হচ্ছে অভ্যাসের নিয়মে আস্থাশীল শব্দস্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি, কবি রবীন্দ্রনাথের নয়। সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন তৈরি করেন অনেক শব্দ। আরো অনেক সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অবদানে সমৃদ্ধ হয় শব্দের রাজ্য। এভাবে হারানো শব্দ নতুন মাত্রা ও ব্যঞ্জনা পায়। অভিধানকার মনে করেন কবি সাহিত্যিকদের রচনায় যত শব্দ আছে সেগুলো অভিধানে থাকা উচিত। তাহলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যিক শব্দ-সম্ভারের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারা যায়। তবে ঐ শব্দগুলো যে শুধু সাহিত্যের পৃষ্ঠায় আছে জীবনের পৃষ্ঠায় নেই এবং সেগুলো যে কালপরিক্রমায় ধূসর, বিবর্ণ ও স্বাদগন্ধহীন হয়ে গেছে সে কথাটি তো মানতে হবে। তবু, আগের যুগে সাহিত্যসৃষ্টির সংখ্যা ছিল কম, কিন্তু একালে গদ্যের বিপুল প্রসারের কারণে এবং বহু

শিক্ষিত মানুষের ভাষা-ব্যবহারের সূত্রে ভাষার শব্দরাজ্যও বিশাল এবং ভাষার প্রয়োগবৈচিত্র্যেরও বহুমাত্রিকতা। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ব্যবহৃত শিষ্ট শব্দের বাইরেও রয়েছে সাধারণ স্তরের মানুষের মৌখিক আঞ্চলিক শব্দরাজি। কথাসাহিত্যিকেরা, নাট্যকারেরা, এমন কি কবিরাও আঞ্চলিক শব্দ নিয়ত ব্যবহার করেন। শিষ্ট, অশিষ্ট, মৌখিক, আঞ্চলিক সব নিয়েই তো ভাষা। একটি ভাষায় কত শব্দ চালু রয়েছে তা চট করে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার কথা ধরা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। বাংলাতে প্রচলিত-অচলিত মিলিয়ে কত শব্দ তার কোনো প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক জরিপ হয়নি। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, নজরুল তাঁদের সৃষ্টিসম্ভারে কত কত শব্দ বন্দী করেছেন তার সংখ্যাও আমাদের জানা নেই। শব্দজরিপ একটি দুরূহ ও সময়ব্যয়ী কাজ হলেও তা করা প্রয়োজন। *Oxford English Dictionry* প্রণয়নের সময় ইংরেজি ভাষায় কত শব্দ আছে তার জরিপ হয়েছে বলে জানা যায়।

অভিধান-প্রণয়ন একটি অব্যাহত কাজ। অভিধানের অভিযাত্রা পূর্ণতার দিকে, যদিও পূর্ণাঙ্গ অভিধান প্রণীত হয়েছে বলে জানা যায় না। ভাষার পরিব্যাপ্তি, বিকাশ, বিবর্তন ও পরিবর্তনকে ধরে রাখবে অভিধান। বাংলা একটি জীবন্ত ভাষা, প্রকাশক্ষম ঋদ্ধ ভাষা। প্রকৃত অর্থে এ ভাষার অভিধান তৈরির কাজ শুরু হয়েছে আঠার শতকে। মধ্যযুগে অভিধান রচনার রীতি-রেওয়াজ গড়ে ওঠে নি। বাংলা অভিধান প্রণয়নে পর্তুগিজ পাদ্রীরাই পথপ্রদর্শক। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবন শহরে রোমান হরফে মুদ্রিত ম্যানো-এল-দ্য-আস সুম্পসাও-এর পর্তুগিজ-বাংলা দ্বিভাষিক শব্দকোষই *[Vocabulario em idioma Bengala & Partuguez]* হল বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান। পরে খ্রিস্টান মিশনারি ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা অভিধান প্রণয়নে এগিয়ে আসেন। প্রথম বাংলা অক্ষরের চেহারা দেখা গেল এ. আপজনের বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক অভিধানে (১৭৯৩)। সে আমলে কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারী হেনরি পিটস ফরস্টারের বাংলা-ইংরেজি ইংরেজি-বাংলা দুখণ্ডে মুদ্রিত দ্বিভাষিক অভিধানের *[A vocubulary in two parts English and Bengali and Vice-Versa,* ১৭৯৯-১৮০২] খুব খ্যাতি হয়েছিল। প্রথম বাংলা-বাংলা একভাষিক অভিধানের নমুনা হল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের *বঙ্গভাষাভিধান* (১৮১৭)। এভাবে বাংলা অভিধান প্রণীত হয়ে আসছে গত প্রায় দুইশ বছর ধরে। বাংলা অভিধান গ্রন্থের ইতিহাস বিষয়ক একাধিক রচনায়[২] প্রদত্ত তথ্যে এটি বোঝা যায় যে, বাংলা অভিধানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সুপরিচিত ও উল্লেখযোগ্য বাংলা অভিধানগুলোর মধ্যে রয়েছে রামকমল বিদ্যালঙ্কারের *প্রকৃতিবাদ অভিধান* (১৮৬৬), সুবল মিত্রের *সরল বাঙ্গালা অভিধান* (১৯০৬), যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির *বাঙ্গালা শব্দকোষ* (১৩২০-১৩২২), জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (১৯১৭), হরিচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১৯৩২-১৯৫১), রাজশেখর বসুর *চলন্তিকা* (১৯৩০), সাহিত্য সংসদের *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (১৯৫৫); কাজী আবদুল ওদুদের *ব্যবহারিক শব্দকোষ* (১৯৫৩), বাংলা একাডেমীর *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (১৯৭৪-১৯৮৪), ও *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (১৯৯২)। সব অভিধান যে সম্পূর্ণ নয় এবং সব অভিধান যে সবাইকে সন্তুষ্ট করবে না তা বলা বাহুল্য। কোনো অভিধান হয়তো নির্বিচার শব্দসংগ্রহের স্তূপ, কোনোটিতে হয়তো সংস্কৃত শব্দের ভুক্তি বেশি, কোনো অভিধানে আরবি-ফারসি শব্দ নেই, কোনো অভিধানে শব্দের উৎসনির্দেশ ও ব্যুৎপত্তি-বিশ্লেষণ ত্রুটিযুক্ত, কোনো অভিধানে শব্দের প্রয়োগরূপ দেখানো হয়নি ইত্যাকার নানা অভাব ও ত্রুটি অভিধানগুলোতে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ফরস্টারের প্রশংসা এই জন্য যে, তাঁর অভিধানের মধ্যেই প্রথম ইংরেজি অভিধানের অনুসরণে বর্ণানুক্রমিক শব্দ-পরিসজ্জা আছে, কিন্তু ফরস্টার যে আরবি-ফারসিজাত মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে সংস্কৃত শব্দের সংকলন বেশি করেছেন সে অভিযোগও উঠেছে। উইলিয়ম কেরির বিখ্যাত অভিধান *A Dictionary of the Bengali Language* (১৮১৫-১৮২৫) সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এটি অনেকাংশে সংস্কৃত শব্দকোষের মতো। হয়তো আঠার শতকের শেষের কিংবা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পণ্ডিতী বাংলা সাধুভাষার রূপগঠনকালের প্রভাব এ জাতীয় অভিধান প্রণয়নে পড়েছিল। পণ্ডিতেরা যে প্রাকৃত বাংলা থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন সে কথাটি অসত্য নয়। প্রথম যুগের বাংলা-বাংলা একভাষিক অভিধানগুলোতে সুবিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান *অমরকোষের* সর্বব্যাপী প্রভাব নিয়েও অভিযোগ তুলে বলা হয়েছিল, এগুলো ঠিক বাংলা অভিধান নয়, বাংলা হরফে লেখা সংস্কৃত-অভিধানমাত্র। এ রীতিতে প্রণীত অভিধানের বিরুদ্ধে গিয়েই যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শুধু অসংস্কৃত শব্দ নিয়ে চার খণ্ডে *বাঙ্গালা শব্দকোষ* লিখেছিলেন। কিন্তু এ হচ্ছে একপেশে চরম প্রতিক্রিয়া। বাংলা শব্দভাণ্ডার থেকে সংস্কৃত শব্দকে বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বঙ্কিমের কথা মনে পড়ে। বঙ্কিম লিখেছিলেন :

> বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হয়। কর্জ্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য [বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৪]।

এ ব্যাপারে বঙ্কিম যে যুক্তিটা দিয়েছিলেন তা হল এই যে, সংস্কৃত থেকে শব্দ নিলে তা বাংলার সঙ্গে ভালো মেশে। প্রয়োজনসাপেক্ষে সংস্কৃতের কাছ থেকে ঋণ তো নিতেই হবে, কিন্তু তা বলে সংস্কৃতের আধিপত্য কাম্য নয়। শুধু সংস্কৃত শব্দ নয়, সংস্কৃতজাত শব্দ, দেশি শব্দ, বাঙালির ব্যবহৃত আরবি, ফারসি, ইংরেজি,

পর্তুগিজ শব্দগুলো নিয়েই বাংলা ভাষার শরীর গড়ে উঠেছে। সুতরাং বাংলা অভিধানে সব শ্রেণির শব্দই সমান গুরুত্ব পাবে। কেউ যদি আলাদা করে দেশি শব্দের বা সংস্কৃত শব্দের কিংবা আরবি-ফারসি ও ইংরেজি শব্দের অভিধান করতে চান তাহলে সে-সব অভিধানেরও উপযোগিতা থাকবে, কিন্তু সেগুলো বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান হবে না। বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধানে কোন্ কোন্ শ্রেণির শব্দ থাকবে তা নিয়ে বহু বছর আগে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলে গিয়েছেন :

> বাঙ্গালা ভাষার সম্পূর্ণ কোষগ্রন্থে দুই শ্রেণীর শব্দ থাকিবে- (১) 'খাঁটি' সংস্কৃত শব্দ ও (২) খাঁটি বাঙ্গালা। রচনার ভাষায় ও কথার ভাষায় দুই শ্রেণীর শব্দই প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩৫৬]।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অবশ্য অভিধান রচনা করেন নি। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অভিধান পরিকল্পনা ও বাংলা ব্যাকরণ রচনার আদর্শ নিয়ে লিখেছিলেন। তিনি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও খাঁটি বাংলা শব্দের কথা উল্লেখ করলেও আরবি ফারসি ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশী শব্দগুলো নিয়ে কিছু বলেন নি। তবে অভিধানে শব্দভুক্তির ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট মত হলো এই :

> সম্পূর্ণ তালিকা সঙ্কলন অসাধ্য ব্যাপার; তবে যথাসাধ্য সম্পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কোন শব্দকেই বর্জ্জন করিলে চলিবে না। সকলেরই আদর সমান [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩৫৬]।

সকল শব্দকে আদর দিতে গেলে অভিধান মেদময় স্ফীত হয়ে ওঠে। এর প্রমাণ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণের বৃহৎবপু অভিধানদ্বয়। সকল বাংলা শব্দের কথা মনে রেখে হরিচরণ যেমন তাঁর অভিধানের নাম দিয়েছেন *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, জ্ঞানেন্দ্রমোহনও তেমনি তাঁর অভিধানের নামকরণ করেছেন *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৩৭) শব্দসংখ্যা ১,১৫০০০-এ উন্নীত হয়েছে। এরকম বৃহৎ অভিধান মূল্যবান বটে, কিন্তু নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা। তবে উল্লেখ্য যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে শব্দের উচ্চারণ দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়াস আছে। বাংলা অভিধানের সবচেয়ে বড় অভাব হল ইংরেজি অভিধানের মতো শব্দের উচ্চারণ-সংকেত নেই। উচ্চারণ নিয়ে বাংলাভাষী শিক্ষিত সমাজে বড় বিভ্রান্তি আছে এবং তাদের মুখে যে সকল শব্দের উচ্চারণ ঠিকভাবে

আসে তাও নয়। উচ্চারণ-বিশেষজ্ঞের উচ্চারণও হয়তো ঠিক নয়। আর বিদেশীরা, যারা বাংলা শিখতে চায়, তারা উচ্চারণ নিয়ে রীতিমতো হিমসিম খায়। কোন্‌টি স্বরান্ত কোন্‌টি হলন্ত উচ্চারণ তা বুঝতে তাদের তো বিরাট অসুবিধাই, কোনো কোনো বাংলাভাষীর ক্ষেত্রেও এটি একটি সমস্যা। স্বাভাবিক অভ্যাসে সবকিছু সবসময় রপ্ত হয়ে যায় না। এ সব কারণে বাংলা অভিধানে উচ্চারণ থাকা অতীব জরুরি। সম্প্রতি এ-অভাব পূরণের জন্য বাংলাভাষী অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে উচ্চারণ অভিধান প্রণীত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত নরেন বিশ্বাসের *বাংলা উচ্চারণ অভিধানের* নাম উল্লেখ করতে হয়। এটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু এটি শুধু উচ্চারণেরই অভিধান; উচ্চারণের সঙ্গে শব্দের *ক্যাটাগরি*, অর্থ ইত্যাদি দেওয়া থাকলে অভিধানটির ব্যবহারিক উপযোগিতা বেড়ে যেত। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমালা দিয়ে উচ্চারণ বুঝিয়ে দিলে আরো সুন্দর হত। বাংলাভাষী অঞ্চলে বাংলাভাষা ব্যবহারের ব্যাপকতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে আরো অনেক উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ অভিধান প্রণীত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে একটি হল বানান অভিধান [বাংলা একাডেমীর *বানান অভিধান*]। লেখ্য ভাষায় চলতি রীতির অবিসম্বাদিত প্রতিষ্ঠার কারণে বাংলা বানানে যে স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিবিধানে শৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়োজনে আনুশাসনিক বিধান দানে সচেষ্ট হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং বাংলাভাষা উন্নয়নের জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি। বানানের বিশৃঙ্খলা মোটেও কাম্য নয়। তেমনি কাম্য নয় শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ। এ জন্য প্রণীত হয়েছে প্রয়োগ অভিধান [সুভাষ ভট্টাচার্য ও বাংলা একাডেমী]। শব্দের প্রয়োগ বৈচিত্র্য বোঝানোর জন্য সংস্কৃত নানার্থ ও পর্যায় অভিধানের মতো বাংলা অভিধানও রচিত হয়েছে [মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের *যথাশব্দ*, অশোক মুখোপাধ্যায়ের *সমার্থক শব্দকোষ*]। এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হবে পুরাণ অভিধান, চরিতাভিধান, ইতিহাস অভিধানজাতীয় বিশেষ কোষগ্রন্থসমূহ এবং দর্শন, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, অর্থনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশলবিদ্যা, প্রযুক্তি, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সমাজবিদ্যা, প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা কোষগুলিও। অভিধান ছোট বড় মাঝারি যে আকারের হোক না কেন এবং যে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত হোক না কেন, এগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োজনই হল আসল কথা। এমনিতে আলাদা করে কোনো অভিধানকে 'ব্যবহারিক অভিধান' বলার তাৎপর্য নেই। সব অভিধানই ব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয়। তবু আমাদের আলোচনায় 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' বলতে আমরা সেই শ্রেণির বাংলা অভিধানকে বোঝাতে চাইছি যা আকারে ছোট, সহজে নাড়া চাড়া করতে পারা যায় যা, যা সুবহ, এবং যা প্রধানত বাংলা শব্দের চলমান রূপের পরিচায়ক।

মেদবর্জিত ক্ষুদ্রদেহ এবং মোটামুটি সকল কাজের উপযোগী বাংলা অভিধানই হল ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। এই শ্রেণির অভিধানের মধ্যে প্রথমে যে নাম উল্লেখ করতে হয় তা হল রাজশেখর বসুর *চলন্তিকা* (১৯৩০)।

চলন্তিকা বেরিয়েছিল এক ঐতিহাসিক সময়ে। ইংরেজ আমলে সরকারি কাজকর্মে ও শিক্ষার স্তরে ইংরেজির একচ্ছত্র আধিপত্য থাকলেও বাংলা ভাষার বিকাশ হচ্ছিল দ্রুত এবং সেই বিকাশের স্পষ্ট পরিচয়চিহ্ন বহন করল বাংলা গদ্য। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে ছিল বাংলা সাধুরীতির দুর্দান্ত রাজত্ব। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী বাংলার পথ ধরে সেই সাধুরীতি বিশ শতকের গোড়ার দিকে এসে মৌখিক রীতির সঙ্গে একটা রফা করে চলছিল। কিন্তু 'বীরবলী বাংলা' এসে হৈ চৈ কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। প্রমথ চৌধুরী বাংলা লেখ্য ভাষার আদর্শ হিসেবে সাধুরীতির বদলে চলিত রীতিকে গ্রহণ করলেন এবং 'যে ভাষায় কথা কই' সে ভাষায় লিখবার আন্দোলন গড়ে তুললেন। প্রথম চৌধুরীর আন্দোলন এমনিতেই সফল হত, কেননা ভাষার গতি ছিল ঐ দিকে, তবু প্রমথ চৌধুরীর সুবিধা হল এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ সমর্থন পেলেন এবং সঙ্গে পেলেন একঝাঁক উদ্যমী তরুণ লেখককে যাঁরা শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখের ভাষা আর লেখ্য ভাষায় ভেদ ঘটিয়ে দিতে তৎপর হলেন। লেখ্য ভাষা হিসেবে চলিত রীতির প্রতিষ্ঠা বাংলা ভাষার শব্দ নির্বাচনে, বাক্যগঠনে, পদসংগঠনে ও বানানে বড় পরিবর্তন নিয়ে এল। রাজশেখর বসু নিজেও মস্ত লেখক। তিনি পর্যবেক্ষণ করছিলেন সাধুচলিতের দ্বন্দ্বে বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতির স্বরূপকে। 'বাংলা ভাষার গতি' নামের একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, এখন সাধু চলিতের ব্যবহারের অনুপাত হল ৫০ ঃ ৫০, তবে ঝোঁকটা চলিত রীতির দিকে—

> আজকাল বাংলায় যা কিছু লেখা হয় তার বোধ হয় অর্ধেক চলিত ভাষায়। সাধুভাষা এখন প্রধানত খবরের কাগজে, সরকারী বিজ্ঞাপনে, দলিলে আর স্কুল পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায়। অধিকাংশ গল্প এখন চলিত ভাষাতে লেখা হয় [রাজশেখর বসু ১৩৬৩ : ১০১]।

ঐ প্রবন্ধে তিনি এও বলেছেন যে, মৌখিক রীতিতে প্রাদেশিক বিকৃতি থাকলেও লেখায় তা থাকা অনুচিত, যেহেতু চলিত ভাষাও সাধু ভাষার মতো লেখ্য ভাষা এবং সেটিও নিয়ম-বন্ধনের অধীন, অনুশাসননির্ভর; স্বেচ্ছাচারী নয়, সে জন্য সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার বিস্তর রফা দরকার। একই কথার প্রতিধ্বনি রয়েছে অন্যত্র :

> চলিত ভাষাই একমাত্র লৈখিক ভাষা হতে পারে যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধু ভাষার সঙ্গে রফা করা হয় [রাজশেখর বসু ১৩৮৬ : ৮৬]।

এই কথাগুলো *চলন্তিকার* ভুমিকাতেও আছে। কথাগুলো তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্য যে, সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপের পার্থক্য ছাড়া অনেক লেখায় সাধু চলিতের ভিন্নতা নিরূপণ খুবই কষ্টকর। বাংলা গদ্যের শিল্পীদের শৈলীর কারদানিও কম নয়। বাংলা ভাষায় এত অভিধান থাকতে আরেকটি অভিধান প্রণয়নের প্রয়োজন কেন হল সে সম্পর্কে রাজশেখর বসু *চলন্তিকার* ভূমিকাতে বলেছেন :

> বাংলা ভাষার একটি ছোট অভিধানের দরকার আছে—যাহা সহজে নাড়া চাড়া করিতে পারা যায় অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে। যাঁহারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁহারা প্রধানত যে প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য লইয়া থাকেন, বিনা বাহুল্যে তাহা সাধিত করাই এ অভিধানের উদ্দেশ্য [রাজশেখর বসু ১৩৫৮]।

চলন্তিকার প্রথম সংস্করণে ছিল ২৬০০০ শব্দ, তৃতীয় সংস্করণে এসে শব্দসংখ্যা হয় ৩০,০০০। শব্দ নির্বাচনের নীতি প্রসঙ্গে অভিধানকার বলেন :

> আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচলিত ও প্রচলনযোগ্য শব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং এই সকল শব্দের যথোচিত বিবৃতির স্থান করিবার জন্য অল্প প্রচলিত শব্দ যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্যে প্রয়োজ্য চলিত ভাষার অধিকাংশ শব্দ এই অভিধানে পাওয়া যাইবে [রাজশেখর বসু ১৩৫৮]।

বোঝা যায় *চলন্তিকা* প্রণয়নের উদ্দেশ্য একালের আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির রুচিবৃদ্ধির ও ভাষিক প্রয়োজনের জোগান দেওয়া। পৃথিবী তো এক জায়গাতে বসে নেই, পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে সর্বত্র, ভাষার দেহেও। সে পরিবর্তনের পরিচয় থাকবে অভিধানে এবং এটি না থাকলে তো *চলন্তিকাই* হয় না। এই কথা মনে রেখে অভিধানকার রাজশেখর বসুকে শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকটা নির্মম হতে হয়েছে, পুরোনো অভিধানের অনেক শব্দ বাদ দিতে হয়েছে এবং প্রধানভাবে দৃষ্টি দিতে হয়েছে বাংলা ভাষার চলমান রূপের প্রতি। সঙ্গত কারণে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক বানান রীতিও গ্রহণ করেছেন তিনি। ভাষায় চলিত রীতির প্রতিষ্ঠার কারণে ঐ সময় বিচলিত বাংলা বানানে শৃঙ্খলা ও সমতা আনার লক্ষ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্যোগী হতে হয়েছিল। সে উদ্যোগে *চলন্তিকার* সায় ছিল পুরোপুরি। *চলন্তিকা* অবশ্য নতুন বানানের সঙ্গে পুরোনো বানানও রেখে দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। অভিধানের সংকলন-রীতিতে *চলন্তিকাতে* আছে সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। রাজশেখর বসু সংকেতচিহ্ন দিয়ে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন; পর্যায় শব্দগুলোকে যথাসম্ভব নির্দেশ করতে চেয়েছেন, শব্দের অন্যান্য *ক্যাটাগরি*, ক্রিয়ারূপ ও বিভক্তিকে সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, এবং অভিধানের শেষে একটি বিস্তৃত পরিশিষ্ট দিয়েছেন। এতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মাবলি (৩য় সং, ১৯৩৬) সংকলিত হয়েছে, ণ-ত্ব ষত্ব বিধি, সন্ধি, কারক, সর্বনামের রূপ, সংখ্যাবাচক শব্দ ইত্যাদির সূত্র ও দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে, অশুদ্ধ শব্দ নির্দেশ করা হয়েছে এবং গণিত, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের, ভূগোল ও অর্থনীতির এবং সরকারি কাজের প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দ ও *টার্ম*গুলোর বাংলা পরিভাষা করে দেওয়া হয়েছে। এতে অভিধানটি ব্যবহার করতে খুব সুবিধা হয়েছে এবং সকলেরই প্রয়োজনে উপযোগী হয়েছে অভিধানটি। রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং আরো অনেকে অভিধানটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অভিধানটি বেরুনোর অল্পদিনের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *প্রবাসী* পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৩৭) 'অভিধান' শিরোনামায় *চলন্তিকার* একটি অতি সুন্দর আলোচনা করেন। এতে তিনিও বলেন যে, এরকম একটি ছোট অভিধানের বড় প্রয়োজন ছিল। তাঁর মতে এই অভিধানে চমৎকারভাবে সংকেতচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে সংস্কৃত ও চলিত শব্দগুলো বুঝতে সুবিধা হয়েছে। বানান অনুসারে ক্রিয়ামূলকে ২০টি গণ বা ভাগে বিভক্ত করে সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং সাধু ও চলিত রূপভেদে পুরুষ, বচন, কাল, তিঙন্ত নিজন্ত কৃদন্ত ইত্যাদি বহুরূপী বাংলা ক্রিয়াকে সুশৃঙ্খলভাবে বোঝানোও হয়েছে। পারিভাষিক শব্দ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদের অনুকূল মত ছিল না। তিনি মনে করেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের যে শব্দগুলো অন্য ভাষা থেকে এসেছে সেগুলি অবিকল থাকা ভালো—

> যে ভাষায় একটা পারিভাষিক শব্দের উৎপত্তি হয়, অন্য ভাষায়ও সেই শব্দটা ব্যবহার করে [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩৩৭ : ৮৬৭]।

হরপ্রসাদের এই মত সবাই গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না। তবে অনেক

ইংরেজি শব্দ যে আমরা অবিকল নিয়েছি সে কথাও ঠিক এবং ভাষায় সেগুলোই চলমান— যেমন বাস, সাইকেল, পেন্সিল, ফাইল, ফ্যান, ফ্রিজ, টেলিভিশন, লাইসেন্স, বাজেট, পুলিশ, ব্যাংক ইত্যাদি এবং আরো অসংখ্য শব্দ। মনে হয় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্রের চেয়ে *ফিজিক্স, কেমেস্ট্রিই* বেশি চালু শব্দ। তবু পরিভাষা থাকা উচিত, এতে ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা ও প্রায়োগিক যোগ্যতা বাড়ে; ভাষা যে দীন নয় সেটিও প্রমাণিত হয় এবং ভাষার অভিধানও ঋদ্ধ হয়। সুতরাং রাজশেখর বসু পরিভাষা দিয়ে বেশ ভালো কাজ করেছেন। সব মিলিয়ে বলা যাবে রাজশেখর বসুর *চলন্তিকা* একটি অতি উপযোগী অভিধান এবং ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের এইটিই হচ্ছে *মডেল* যা পরবর্তী অভিধানকারেরা অনুসরণ করেছেন। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে, হাস্যরসিক গল্পকার রাজশেখর বসুর, আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে *চলন্তিকা* অভিধান প্রণয়ন একটি মহৎ কর্ম।

বিখ্যাত সাহিত্যিক কাজী আব্দুল ওদুদ সংকলিত *ব্যবহারিক শব্দকোষ*ও (১৯৫৩) একটি পরিচিত বাংলা অভিধান। অনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬৭) অভিধানটির কলেবর বেড়ে যায় এবং শব্দ সংখ্যা হয় প্রায় ৬৪ হাজার। অভিধানটির জনপ্রিয়তা *চলন্তিকার* মতো না হলেও এটি যে একটি সুন্দর ব্যবহারযোগ্য শব্দকোষ সে কথা মানতে হবে। অভিধানটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে :

> বাংলা ভাষা তার বিচিত্রমূল সাধারণ অ-সাধারণ শব্দ ও শব্দ-সংক্ষেপ নিয়ে বর্তমানে যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছে, ক্ষেত্র বিশেষে করতে চাচ্ছে, সে-সবের সঙ্গে প্রধানত: শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটানো ব্যবহারিক শব্দকোষের উদ্দেশ্য [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬৭]।

বোঝা যাচ্ছে যে, এই অভিধানকারেরও প্রধান মনোযোগ বাংলা ভাষার বর্তমান রূপের প্রতি অর্থাৎ চলন্তিকার প্রতি। তবে তিনি শব্দের নানার্থ ও সমার্থ নির্দেশের প্রতি বেশি জোর দেননি, বরং তাঁর জোর পড়েছে শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগের প্রতি। এ-কারণে এ অভিধানে শব্দের প্রয়োগরূপ ও প্রয়োগ-উদ্ধৃতি বেশি রয়েছে। উদ্ধৃতিগুলো প্রায় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথেরই এবং সেগুলো সুপ্রযুক্ত। নজরুল ইসলামের এবং আরো কোনো কোনো কবির উদ্ধৃতিও আছে। আবার ছোট রেখে কত শব্দ সন্নিবিষ্ট করা যায় সেইটিই ছিল অভিধানকারের উদ্দেশ্য। *চলন্তিকার* সঙ্গে তুলনা করলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে :

চলন্তিকা	ব্যবহারিক শব্দকোষ	
ঘর-	ঘর-	ঘর বসত
ঘর করনা/কন্না	ঘর আলো করা	ঘর বসানো
ঘরজামাই	ঘর কন্না/ঘর করনা/-না	ঘর বার করা
ঘরজোড়া	ঘর করা	ঘর ভাঙ্গানো
ঘরপোড়া	ঘর কাটা	ঘর ভাঙ্গানে (স্ত্রী,ঘর ভাঙ্গানী
ঘরপোষা	ঘর কুণো/- নো	ঘর ভেদী
ঘর ভাঙানে (স্ত্রী,-নী)	ঘর খরচ	ঘর মজানো
ঘরমুখো	ঘর খোঁজা	ঘর মারা
ঘর সন্ধান	ঘর ঘর	ঘর মুখো
= মোট ৮	ঘর ছাড়া	ঘর-শত্রু
	ঘর ছাড়ানো	ঘর-সংসার
	ঘর জাত করা	ঘর সন্ধানী
বিশিষ্টার্থে আরো	ঘরজামাই	ঘর সাজানো
রয়েছে ঘর করা	ঘরজোড়া	ঘরে আগুন দেওয়া
ঘর তোলা	ঘর জ্বালানে (-নো)	ঘরে-পরে
ঘর বাঁধা		ঘরের ঢেঁকি কুমীর হওয়া
ঘর ভাঙানো	ঘর ঢোকা	ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো
= মোট ৪	ঘর তোলা	বড় ঘর
সর্বমোট = ১২	ঘর থাকতে বাবুই ভেজে	= মোট ৪১
	ঘর নষ্ট করা	
	ঘর নিকানো	
	ঘরপোড়া	
	ঘরপোড়ার কাঠ	
	ঘরপোড়া গরু	
	ঘর বর	

চলন্তিকা	ব্যবহারিক শব্দকোষ	
মধু-	মধু-	মধুপবন
মধুকর [স্ত্রী মধুকরী	মধুক	মধুপর্ক
(মাধুকরী)]		মধুপুর, মধুপুরী
মধুকৈটভ	মধুকণ্ঠ	মধুপুষ্প
মধুক্রম	মধুকর (স্ত্রী, মধুকরী)	মধুপুষ্পা
মধুচক্র		মধুপূর্ণিমা

৺মধুচন্দ্র
মধুপ
মধুপর্ক
মধুপুরী
মধুবর্ষী
মধুব্রত
মধুমক্ষিকা
মধুময়
মধুমাধন
মধুসুখ
মধুসূদন = ১৫

বিশিষ্টার্থে-
মধুযামিনী
মধুমাস
মধুমাধ্বী, মধুমাধ্বীক
= ৩
মোট = ১৮ টি

মধুকাল
মধুকৃৎ
মধুকৈটভ
মধুকোদক
মধুকোষ
মধুক্রম (- জালক)
মধুক্ষরা
মধুক্ষীর
মধুঘোষ (-গায়ন)
মধুচক্র (-চ্ছত্র)
৺মধুচন্দ্র
মধুচ্ছন্দঃ
মধুজ
মধুজা
মধুজালক
মধুজিৎ (-মথন)
মধুজীব (-জীবী)
মধুতৃণ
মধুত্রয়
মধুদ্রুম
মধুধুলি
মধুনির্গম
মধুনিশা (-নিশি,- যামিনী)
মধুপ
মধুপটল
মধুপবণ
মধুপর্ক
মধুপুর, মধুপুরী
মধুপুষ্প
মধুপুষ্পা
মধুপূর্ণিমা

মধুপ্রমেহ
মধুপ্রিয়
মধুবন
মধুবর্ষী
মধুবল্লী
মধুবার
মধুব্রত
মধুভৃৎ
মধুমক্ষিকা
মধুমত্ত
মধুময়
মধুমাধব
মধুমাধ্বীক (-মাধবী)
মধুমাস
মধুমূল
মধুমেহ
মধু যষ্টি (-যষ্টিকা)
মধুর
মধুরস
মধুরিপু
মধুলিট্ (-লিহ,- লেহ,- লেহী)

মধুশর্করা
মধুসখা (-সহায়,-সারথি, -সুহৃদ)
মধুসূদন
মধুস্রব (স্ত্রী-স্রবা)
মধুর মধুর
মধুর রস
মধুরাক্ষর
মধুরাম্ল
মধুরিমা
মোট = ৬৪

দুটি দৃষ্টান্তে বোঝা যাচ্ছে যে, একই শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য শব্দের ভুক্তি, *চলন্তিকার* তুলনায় *ব্যবহারিক শব্দকোষে* অনেক বেশি। অবশ্য এটি ঠিক *চলন্তিকা* স্বল্প পরিসরে একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থজ্ঞাপক রূপগুলো চমৎকারভাবে সাজাতে পেরেছে, যেমন সাদা শব্দের ব্যবহার সাদা কাগজ,-হাত,-চুড়ি,-মন ইত্যাদি। এগুলোর প্রয়োগার্থ *চলন্তিকা* দেয়নি। *চলন্তিকা* যে বড় আকারের অভিধান হয়নি তা এই কারণেই। *ব্যবহারিক শব্দকোষ* কিন্তু একই শব্দের আওতাধীন আর যত শব্দ বা প্রয়োগ রূপ আছে সেগুলোকে জড়ো করেছে এবং প্রত্যেকটিকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে অর্থও দিয়েছে। যেমন ঐ 'সাদা' শব্দসম্পৃক্ত অন্যান্য প্রয়োগ সাদা কথা, সাদা কাগজ, সাদা কাগজে সই দেওয়া, সাদা চোখ, সাদা মন, সাদামাঠা, সাদা হাত, সাদাকে কালো কালোকে সাদা করা ইত্যাদি। প্রয়োগবৈচিত্র্যে জোর দেওয়ার কারণে *ব্যবহারিক শব্দকোষে* প্রবাদ প্রবচন ও বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের নমুনাও বেশি। *চলন্তিকা* শব্দের ব্যুৎপত্তিদানে কৃচ্ছ্রতা দেখিয়েছে, পক্ষান্তরে শব্দকোষে অধিকাংশ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে। *চলন্তিকার* তুলনায় *ব্যবহারিক শব্দকোষে* বেশি সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃতজাত শব্দ, দেশী ও বিদেশী শব্দ, অর্থাৎ সব ধরনের শব্দের সংখ্যা অধিক। *চলন্তিকাতেও* আরবি ফারসি শব্দ আছে, কিন্তু *ব্যবহারিক শব্দকোষে* আরবি ফারসি শব্দ যে অনেক অনেক বেশি তা ঠিক। অভিধান রচনাকালে সংকলকের দৃষ্টি এ ব্যাপারে যে বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল তা 'নিবেদন' অংশে জানা যায় :

> বাংলার মুসলমান সমাজে প্রচলিত অথচ বাংলা অভিধানে সাধারণত অচলিত শব্দগুলোও সংকলন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলমান-সমাজের চিত্র বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সবের প্রয়োজনীয়তা সহজেই বৃদ্ধি পাবে [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬৭]।

মুসলমানেরা বাঙালিরই অংশ, বাইরের কেউ নয়, সুতরাং মুসলমান সংস্কৃতিসম্পৃক্ত আরবি ফারসি শব্দের যেগুলো বাংলা ভাষার চলমান অংশ, সেগুলি মোটেও অভিধানবর্জিত হওয়া উচিত নয়। *চলন্তিকা* এদিকের প্রতি বেখেয়াল নয়, আর *ব্যবহারিক শব্দকোষ*তো মোটেও নয়, বরং অধিক সচেতন; এ-কারণে *ব্যবহারিক শব্দকোষ* মুসলমানদের আদরনীয় হয়েছে। এই অভিধানে সংস্কৃত শব্দগুলোর যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়েছে, সংকেত দিয়ে শব্দের জাতি ও পদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। *চলন্তিকার* মতো এ-অভিধানেরও পরিশিষ্ট অংশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানের নিয়মাবলী (১৯৩৬) এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিষয়ের পরিভাষা সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে বানানের নিয়ম মানা হয়নি। 'নিবেদনে' বলা হয়েছে— "সমস্ত বিদেশী s ধ্বনি 'স'-এর দ্বারা

ব্যক্ত করা হয়েছে"। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। যেমন ইংরেজি Stocking, Steam, Steel, State, Station, Stamp, Standard, Street ইত্যাদি লেখা হয়েছে ষ্টকিং, ষ্টীম, ষ্টীল, ষ্টেট, ষ্টেশন, ষ্ট্যাম্প, ষ্ট্যান্ডার্ড, ষ্ট্রীট (দ্বিসং পৃ. ৯৭০)। প্রতিবর্ণীকরণে ষ-ত্ব বিধান মানা হয়েছে, ণ-ত্ব বিধানও।

চলন্তিকার প্রকাশ হয়েছিল ইংরেজ আমলে, আর *সংসদ বাঙালা অভিধান* প্রণীত হল ভারত বিভক্তির পরে (১৯৫৫)। উনিশ শতক থেকেই কলকাতা বাংলা সাহিত্য-চর্চার সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র— সেখানে বাংলা সাহিত্যচর্চার ধারা বরাবরই স্বচ্ছন্দ ছিল, তবে রাজনৈতিক কারণে দেশের ভূগোলের পরিবর্তন ঘটাতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, সংস্কৃতি ও প্রশাসন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছিল। এদিকে পূর্ববঙ্গীয় সমাজে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশেও বাংলা ভাষা জাতীয় জীবনে অধিক গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। এখানেও সাহিত্যচর্চা ব্যাপক হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ততদিনে বাংলা চলিত ভাষারও নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে; শিক্ষিত শ্রেণির কথায় কাজে লেখায় চলিত রীতির ব্যবহারের সুবাদে প্রচুর নতুন শব্দও বাংলা ভাষার দেহে প্রবেশ করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন একটি অভিধান প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিল। সেই সূত্রে *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*-এর আবির্ভাব (১৯৫৫)। এ অভিধানের উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রোত্তরকালের প্রায় সব বড় লেখক ও প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা রয়েছেন, এবং এঁদের উপদেশ ও পরামর্শে অভিধানটি সমৃদ্ধ হয়েছে বলে অভিধানকার উল্লেখ করেছেন। সাহিত্য সংসদের এই অভিধান সংকলন করেছেন শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংশোধন করেছেন ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত (২য় সংস্করণ পর্যন্ত), এবং পরে সংস্কৃতের প্রাজ্ঞ অধ্যাপক দিনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। *সংসদ বাঙালা অভিধান চলন্তিকার* আদলে রচিত একটি ভালো অভিধান এবং বাংলা ব্যবহারিক অভিধানগুলোর মধ্যে এইটি বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উভয় বাংলাতে সবচাইতে চালু ও জনপ্রিয় অভিধান। অভিধানটির অঙ্গসৌষ্ঠব, সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ছাপা, সুলভতা জনপ্রিয়তার কারণ হতে পারে। ৪০ হাজার শব্দ নিয়ে এ-অভিধানের যাত্রা শুরু হয়েছিল, পরবর্তী সংস্করণগুলোতে শব্দ সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। অভিধানের শব্দ নির্বাচনে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে সাহিত্য, পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্রে ব্যবহৃত বাংলা শব্দের উপরে। আজকাল বাঙালি যে বেশি পরিমাণে সংবাদপত্রসেবী সে কথাও সত্য। ভাষার প্রায়োগিক রূপের সঙ্গে হরদম পরিচয় ঘটে চলেছে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের প্রতি যে অভিধানকারের বেশি মনোযোগ সেটি 'ভূমিকা' পাঠে বোঝা যায় :

> ইহাতে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সমস্ত তৎসম, তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে অপ্রচলিত এবং পূর্বেও নিতান্ত বিরল-ব্যবহার

শব্দাবলী সাধারণতঃ বর্জন করা হইয়াছে। তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য বৈষ্ণব-পদাবলী মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী, বর্তমানে অপ্রচলিত হইলেও যথাসম্ভব প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ও আধুনিক উপন্যাসাদিতে সচরাচর ব্যবহৃত বহু প্রাদেশিক শব্দ এবং সুপ্রচলিত আরবি-ফারসি-মূলক শব্দসমূহও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নব-সঙ্কলিত যে-সমস্ত পারিভাষিক শব্দ সংবাদপত্র ও পাঠ্য-পুস্তকাদিতে আজকাল প্রায়শ; ব্যবহৃত হয়, তাহাও ইহাতে নিবন্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু, সাহিত্যে সুপ্রচলিত চলিত ভাষার বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দ সমষ্টিগুলিও (Idiomatic Expressions) ব্যাখ্যাত হইয়াছে [শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ১৯৮৮]।

শব্দের বিশিষ্টার্থে রয়েছে ভাষার ব্যঞ্জনা ও সৌন্দর্য। *ইডিয়ম* বিচিত্র ভাব প্রকাশের সহায়ক, সৌন্দর্যসৃষ্টিরও। বিশিষ্টার্থের দিকে যে *সংসদের* মনোযোগ বেশি সে কথা ঠিক। *সংসদে* চলিত বাংলার সাম্প্রতিক রূপ একটু বেশি দেখানো হয়েছে এবং শব্দের বানানেও আধুনিক রীতি অনুসৃত হয়েছে। *সংসদ* শব্দের *ক্যাটাগরি* বিন্যস্ত করেছে সুন্দরভাবে এবং সংস্কৃত শব্দের যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তিও দিয়েছে। *ব্যবহারিক শব্দকোষের* মতো *সংসদও* একই শব্দের আওতাধীন যত শব্দ আছে সেগুলো সব দিতে চেয়েছে, তবে তা *চলন্তিকার* অনুসরণে সংক্ষিপ্ত রূপে। যেমন 'কাক' শব্দটির ব্যবহার- চক্ষু, -জ্যোৎস্না,-তন্দ্রা,-নিদ্রা,- তালীয়, -পক্ষ, -পদ, -পুচ্ছ, -ফল, -বন্ধ্যা, -ভুশণ্ডি, -শীর্ষ। কাক-কোকিলের সমান দর, কাকের ছাঁ বকের ছাঁ ইত্যাদি *ইডিয়মও* রয়েছে সঙ্গে। *সংসদ* স্বল্প পরিসরে অনেক শব্দ ধরতে পেরেছে। অন্যান্য অভিধানের মতো এতে পর্যায় শব্দগুলোও রয়েছে।

সংসদ বাঙ্গালা অভিধানের পর্যালোচনা করেছেন অমলেন্দু সেন (অমলেন্দু সেন, ১৮৮০ শত পৃ. ৩২১-৩৩০)। তিনি সম্ভবত *ব্যবহারিক শব্দকোষের* পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে সহায়তা করে থাকবেন। তিনি সংসদ অভিধানের শব্দবিন্যাসে বর্ণানুক্রমের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে চন্দ্রবিন্দু, অ্যা, ব-ফলা ইত্যাদি সঠিক অবস্থানে আসেনি। চন্দ্রবিন্দুর অবস্থান *চলন্তিকায়* আর সংসদে এক নয়। 'সব অভিধানে এক নিয়ম হওয়া দরকার' (পৃ. ৩২৬)—এইটি তাঁর অভিমত। তবে তিনি সংসদের শব্দবিন্যাস প্রণালির প্রশংসা করেছেন এই জন্য যে, এতে শব্দের একাধিক বানান যথাস্থানে দেওয়া আছে এবং এতে শব্দ-সংকোচন করে সন্নিবেশ করার নানা কৌশলও দেখানো হয়েছে। এটি অভিধানটির গুণ। তবে ঐ দাবি মানা যাবে না যে 'ইহাতে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সমস্ত তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।' এটি অসম্ভব, আর সব শব্দ দিতে গেলে ব্যবহারিক অভিধানের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। অমলেন্দু সেন অবশ্য জানিয়েছেন, অনেক শব্দ তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর উক্তি: 'নজরুল, জসীমউদ্‌দীন, মুজতবা আলী প্রমুখ আধুনিক মুসলমান

সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় যেসব আরবী ফারসী, উর্দু আর হিন্দী শব্দ নতুন এনেছেন তার অধিকাংশ এতে নেই। তারাশঙ্কর, বনফুল বা বিভূতিভূষণ যে সব গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে সবের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি," (অমলেন্দু সেন ১৮৮০ : ৩২৬)। আর সব অভিধানের মতো সংসদ যে খুঁতহীন অভিধান নয় তা বলা বাহুল্য। এতে ত্রুটি রয়েছে কোনো কোনো শব্দের সংজ্ঞার্থ ঠিকভাবে নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে *সংসদ অভিধান* নিয়ে হুমায়ুন আজাদের মন্তব্য বেশ মজার : "বাংলা অভিধানে সংজ্ঞার শব্দগুলোর সমস্ত তাৎপর্য বিবেচনাও করা হয় না— যেমন একটি অভিধানে 'বাবুই' সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'গৃহনির্মাণে দক্ষ পক্ষি বিশেষ' [শৈলেন্দ্র ১৩৭৬]। শব্দের যে সাম্প্রতিক তাৎপর্য তাতে এ-সংজ্ঞা পড়ে মনে হ'তে পারে যে বাবুই দালানকোঠা নির্মাণে দক্ষ প্রকৌশলী পক্ষী।"[৪] *সংসদ* যে সবসময় এ কাণ্ড করেছে তা মোটেও নয়। তবে *সংসদ* মুসলমান সমাজের একটি অতি পরিচিত শব্দের সম্পূর্ণ ভুল অর্থ দিয়েছে— 'খালা' শব্দের অর্থ করেছে মেসো, আর মাসীর জন্য তৈরি করেছে একটি উদ্ভট স্ত্রীবাচক শব্দ 'খালী'। 'খালু' শব্দের ভুক্তি আছে বটে, কিন্তু অর্থ লেখা হয়েছে 'খালা-র রূপভেদ'। অর্থাৎ খালা-খালু এক, কোনো লিঙ্গভেদ নেই। *সংসদ* সম্ভবত জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সুবিখ্যাত *বাঙালা ভাষার অভিধান*-এর ১৯৩৭ এর সংস্করণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবে। ঐ সংস্করণে দেখছি খালা ও খালু অর্থ মেসো, আর খালী হল মাসীমা। পরে এই অভিধান খালু খালা খালী সব ভুক্তি বর্জন করেছে। *চলন্তিকার* ৭ম সংস্করণেও আমি এই ভুক্তিগুলো দেখিনি, কিন্তু একাদশ সংস্করণে 'খালা' ভুক্তি দেখছি এবং এর অর্থ করা হয়েছে 'মুসলমানী ভাষায় মেসো'। মুসলিম জীবনের সঙ্গে জড়িত শব্দাবলি সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গীয় অভিধান-গুলোর এতখানি অজ্ঞতা মোটেও প্রত্যাশিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা 'মাসী'কে 'খালী' বলে কিনা সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই, বাংলাদেশে বহু পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান স্থায়ী আস্তানা করেছেন, তাঁদের মুখেও কোনোদিন 'খালী' শুনি নি। জামে মসজিদকে 'জুমা মসজিদ' লিখলে বড় ভুল হয়েছে বলে কেউ হয়তো আপত্তি তুলবেন না; কিন্তু 'খালা'র বিকৃত অর্থ ও 'খালী' শব্দের ব্যবহারে প্রচণ্ড আপত্তি থাকবে। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধানের* এত সংস্করণ ও মুদ্রণ হল, কিন্তু এগুলো সংশোধিত হল না কেন সেটি একটি বিস্ময় বটে।

প্রত্যেক পরবর্তী অভিধান পূর্ববর্তী-অভিধানের চেয়ে উন্নততর ও পূর্ণতর হবে এটি স্বাভাবিক প্রত্যাশা। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* প্রসঙ্গে বলবার কথা হল এই, উক্ত সব ব্যত্যয় ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও এটি একটি ভালো ব্যবহারযোগ্য অভিধান। *সংসদে* দুটি পরিশিষ্ট আছে,— পরিশিষ্ট-ক তে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম (১৯৩৬); আর পরিশিষ্ট খ-তে রয়েছে বিভিন্ন বিদ্যার বর্ণানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত ইংরেজি *টার্ম*গুলোর বাংলা পরিভাষা। *চলন্তিকায়* সুবিধা হল কোন্

শব্দটি কোন্ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সেটি জানা যায়, যেহেতু শব্দগুলি বিষয়ের ভিত্তিতে সজ্জিত রয়েছে। *সংসদে* বর্ণানুক্রমে সাজানো বলে কাঙ্ক্ষিত শব্দটি অভিধানের নিয়মে যথাস্থানে পাওয়া যায়।

মুঘলাই শহর ঢাকা যদিও অখণ্ড বাংলার কালেও সাহিত্য সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল, কিন্তু পাকিস্তান না হওয়া পর্যন্ত এর গুরুত্ব ব্যাপকতর হয়নি। যেই পাকিস্তান হল অমনি কলকাতা থেকেও বহু প্রশাসনিক কর্মকর্তার সঙ্গে লেখক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিসেবীরা ঢাকায় এসে ভিড় করতে লাগলেন। যাঁরা এতদিন কলকাতার মুখাপেক্ষী ছিলেন, তাঁরাও ঢাকামুখী হলেন। আস্তে আস্তে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা বঙ্গসংস্কৃতির একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হতে লাগল। পাকিস্তানী আমল পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে ঢাকা ক্রমস্ফীত একটি বিপুল নগরী। ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যও যথেষ্ট প্রভাবশালী। ঢাকার বিকাশ এখনো অব্যাহত রয়েছে। উনিশ শতকের পুরোটা এবং বিশ শতকের অর্ধেকটা সময় সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলে কলকাতার যে একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ ছিল তার বলয় থেকে বেরিয়ে এসে ঢাকায় একটি স্বাধীন সংস্কৃতিভূমি প্রতিষ্ঠায় এ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীরই অবদান সর্বাধিক। দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রূপ ও তার পরিচর্যা স্বাতন্ত্র্যের অপেক্ষা রেখেছিল, কিন্তু এর সীমা ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত যতদূর তা বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির মূল ভূমিতে আঘাত না করে। ঐতিহাসিক কারণে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই মুসলমান, সুতরাং তাদের সাংস্কৃতিক রূপ পশ্চিমবঙ্গের জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রূপের চেয়ে কিছুটা ভিন্নতর হবেই। এ রূপের পরিচয় আছে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের ক্ষেত্রে, সম্বোধনে, অনুষ্ঠানাদিতে ও ধর্মীয় কৃত্যে। এ ভিন্নতা সত্ত্বেও বলা যাবে, পূর্ব বাংলার মুসলমান রক্তে মাংসে বাঙালি, বাংলা এদের মাতৃভাষা এবং বাংলা ভাষার জন্য এরা রক্তও দিয়েছে। সন্দেহ নেই, পূর্ব পাকিস্তান যে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিণত হল তার মূল কারণ অর্থনৈতিক; কিন্তু সাংস্কৃতিক কারণও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতিও স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের উদ্দীপক। পাকিস্তানী আমল থেকেই শিক্ষার স্তরে বাংলা ভাষার গুরুত্ব স্বীকৃতি পায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তা সম্প্রসারিত হয়। বাংলাদেশ আমলে এই সত্য স্পষ্ট হয়েছে যে, শিক্ষার ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে ইংরেজির জন্য হাহাকার থাকলেও ইংরেজির জোর কমেছে, আর বাংলার ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। সেজন্য ভাষা ব্যবহারের উপকরণ সৃষ্টিও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। ভাষার উপকরণের মধ্যে অভিধানও একটি। কিন্তু কী আশ্চর্য, রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পর পাকিস্তানী আমলে বাংলা একাডেমী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি কত কিছু হল; কিন্তু একটি বাংলা অভিধান পাওয়া গেল না। ব্যক্তি উদ্যোগে

কিংবা কোনো বেসরকারী প্রকাশনালয় থেকেও একটি অভিধান বের হল না। দীর্ঘ দীর্ঘ সময় নির্ভর করতে হল পশ্চিমবঙ্গের অভিধানের উপর। শুধু পাকিস্তানী আমলে নয়, বাংলাদেশ আমলেও। সে আমলে যোগ্য অভিধানপ্রণেতার অভাব যে ছিল তা নয়। বৃদ্ধ হলেও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তখনো ছিলেন সক্রিয়, ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতো প্রাজ্ঞ পণ্ডিত, ছিলেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান পড়া অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী। সৈয়দ আলী আহসানের মতো সংগঠকও পারতেন একটি অভিধান তৈরিতে নেতৃত্ব দিতে। ডক্টর আহমদ শরীফ তখন শক্ত সমর্থ, তিনিও একখানি নির্ভরযোগ্য ব্যবহারিক বাংলা অভিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হতে পারতেন। তখনো দু চারজন অভিজ্ঞ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন যাদের উপর অবস্থা রাখা যেত। ওদিকে বাংলা একাডেমী ছোট অভিধান রচনার দিকে না গিয়ে সরকারী অনুদাননির্ভর বৃহৎ পরিকল্পনার অধীনে কয়েক খণ্ডবিশিষ্ট বড় অভিধান প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিল। বাংলা একাডেমীর অভিধান পরিকল্পনার কথা চাউর হয়ে যাওয়ার পর সুধীমহলের প্রতিক্রিয়াও পাওয়া গেল অল্পদিনের মধ্যে। একটি নতুন অভিধান কেন প্রয়োজনীয় তা নিয়ে ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন 'বাংলা অভিধান' নামের একটি আলোচনায় লিখেছিলেন :

> বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষার নূতন একটি অভিধান প্রণয়ন করার ভার গ্রহণ করিয়াছেন শুনা গেল। বাংলা ভাষার একাধিক অভিধান থাকা সত্ত্বেও নূতন একটি অভিধানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না নানা কারণে। প্রথমতঃ পূর্ব পাকিস্তানে এ যাবৎ কোন অভিধান সংকলিত বা প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত অভিধানগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত বহু শব্দ এ সমস্ত অভিধান হইতে বাদ পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ বাংলার এমন অভিধান নাই বা বিরল যাহাতে ইংরেজী অভিধানগুলির মত শব্দের উৎপত্তি, উচ্চারণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে নির্দেশ আছে [সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ১৩৬৪ : ৩৩]।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের কথাগুলোর কোনোটিই অস্বীকার করার মতো ছিল না। শব্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগরূপ দেখানোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি অভিধানের ব্যবহারিক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে এটি বোঝা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক স্বতন্ত্র অভিধানের কথাই বলেছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। অর্থাৎ পরিকল্পিত অভিধানে মুসলমান জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরবি ফারসি শব্দের এবং সর্বজনীনতাপ্রাপ্ত আঞ্চলিক শব্দেরও বহুল ভুক্তি কামনা করেছিলেন তিনি। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই পাকিস্তানী ভাবধারার বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিখ্যাত; সুতরাং বাংলা একাডেমীর

পরিকল্পিত অভিধানের ব্যাপারে তাঁর অভিমতের গুরুত্ব ছিল, হয়তো তিনি সে সময় একাডেমীর পরামর্শক সভার একজন প্রভাবশালী সদস্যও ছিলেন। ঐ 'অভিধান' নামক ছোট প্রবন্ধটিতে তিনি নতুন অভিধান প্রসঙ্গে অনেক ভালো কথা বলেছিলেন, যেমন— অভিধানকার ভাষার ইতিহাস সংকলক, আইনবিদ নন; কিংবা শব্দের অর্থ কী হওয়া উচিত তা নিয়ে সংকলকের ব্যক্তিগত মতামতের কোনো মূল্য নেই; অথবা কোনো শব্দের মূল আরবি, ফারসি, জর্মন, ইংরেজি হলে তাকে অভিধান থেকে বাদ দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত নয় ইত্যাদি। কিন্তু এত সব ভালো কথা বললেও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনও 'ডিম' আর 'আণ্ডা'র সমস্যায় পড়েছিলেন মনে হয়। মুসলমানদের কেউ কেউ কেন বুঝতে চায় না যে 'ডিম' আর 'আণ্ডা' দুটি শব্দই সংস্কৃত উৎসজাত। এই সমার্থক জোড়া- শব্দ 'মাংস' আর 'গোসতের' মতো নয়। তাহলে 'আণ্ডাকে' কেন বলা হবে মুসলিম শব্দ, আর 'ডিমের মধ্যে হিঁদুয়ানী গন্ধই বা কেন পাওয়া যাবে! এ জিজ্ঞাসার সদুত্তর কেউ দেবেন মনে হয় না। অবশ্য শিক্ষিত মুসলমান এখন 'ডিমে'র দিকে বেশি ঝুঁকেছে, 'আণ্ডা'ও আছে, তবে কম। উল্লেখ্য রাজশেখর বসুর *চলন্তিকাতে* 'ডিম' তো আছেই, 'আণ্ডা'ও আছে। সুতরাং সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের এই পর্যবেক্ষণ মানা যায় না যে, বিদেশী বা ইতরোচিত জ্ঞান করে পশ্চিমবঙ্গীয় অভিধান 'আণ্ডা' শব্দটির ভুক্তির ব্যাপারে আপত্তি তুলেছে। তবে এটি ঠিক যে, পশ্চিমবঙ্গের অভিধানগুলিতে অনেক পূর্ববঙ্গীয় শব্দের কিংবা পরিচিত আরবি ফারসি শব্দের স্থান হয় নি। *চলন্তিকার* তুলনায় সংসদ অভিধানে আরবি ফারসি শব্দের ভুক্তি যে বেশি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারপরও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের মতো আমরাও বলব যে, শব্দ নিয়ে ছুঁৎমার্গ মোটেও কাম্য নয়।

বাংলা একাডেমীর যে নতুন অভিধান পরিকল্পনার কথা সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেছিলেন সেটি বাস্তবরূপ পেতে শুধু যে বছর গড়িয়ে গেল তা নয়, পাকিস্তানও দু টুকরো হয়ে গেল এবং পূর্ব পাকিস্তান হল স্বাধীন বাংলাদেশ। একাডেমীর অভিধানটির কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৬১ সালে এবং এর স্বরবর্ণ অংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীন ভূমিতে, ১৯৭৪ সালে। সংকলিত অভিধানটির নাম *বাংলাদেশে ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। এ অভিধান যৌথ কাজ, অনেকের পরিশ্রমের ফল। স্বরবর্ণ অংশের প্রধান সম্পাদক হলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। ডক্টর হক এর আগে প্রকাশিতব্য অভিধানের লক্ষ্য, বিভিন্ন শ্রেণির শব্দভুক্তির নীতি, বানান পদ্ধতি, বর্ণানুক্রম, শব্দবিন্যাস ধারা, উচ্চারণ সংকেত ইত্যাদি নিয়ে 'বাংলাদেশের প্রস্তাবিত অভিধান (প্রস্তুতি নীতি)' নামে একটি আলোচনার খসড়াও করেছিলেন *মনীষা মঞ্জুষা*, ২য় খণ্ড ১৯৭৬)। দেশের অভাব পূরণের জন্য এবং দেশকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অভিধানের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার জন্য এ অভিধান প্রণীত হয়েছে বলে তিনি স্বরবর্ণ

অংশের ভূমিকাতে বলেছেন। ডক্টর হকের বর্ণনায় বহুকাল আগে বাংলা একাডেমী কর্তৃক গৃহীত সামগ্রিক অভিধান পরিকল্পনার কথাও জানা যায় :

> ... আমি যখন বাংলা একাডেমীর পরিচালক ছিলাম, তখন তিনখণ্ডে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার একখানা 'পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। ইহার প্রথম খণ্ডে পূর্ব-পাকিস্তানের উপভাষা, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ্যতঃ পূর্ব পাকিস্তানের অপ্রকাশ্যত: সমগ্র বাংলার সাহিত্যিক ভাষা এবং তৃতীয় খণ্ডে এই সাহিত্যে ব্যবহৃত বাগবিধি (idiom), পরোক্ষোক্তি (allusion), পারিভাষিক শব্দ, ভৌগোলিক নাম, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাম ও ঘটনা, আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার তত্ত্ব ও তথ্যাদি অভিধানিক পদ্ধতিতে স্থান দেওয়ার কথা ছিল [মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৭৪]।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা বলে আলাদা কোনো বাংলা ভাষা নেই। ডক্টর হক যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল একটি স্বাধীন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচর্যার রূপমণ্ডিত ভাষার কথা। সেই অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের তথা একালের বাংলাদেশের বাংলা ভাষার আলাদা পরিচয় দানের সার্থকতা। ডক্টর হকের কথা থেকে এও জানা যাচ্ছে যে একাডেমীর পরিকল্পিত অভিধানের প্রথম খণ্ড হল ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বহু প্রশংসাধন্য *পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* (১৯৬৪)। আর দ্বিতীয় খণ্ডটিই *বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, যার স্বরবর্ণ অংশ ডক্টর হকেরই সম্পাদনা। এই অভিধানের ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ সম্পাদনা করেছেন শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী। অবশ্য ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এর ক বর্গ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন [শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ১৯৯২]। আর বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই অভিধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, আবদুল হক ফরিদী ও ডক্টর আহমদ শরীফ। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৯২) অভিধানটির নাম হয় *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। অভিধানটির তৃতীয় খণ্ড বের করার পরিকল্পনা এখনো একাডেমীর আছে কিনা তা জানি না। একাডেমী যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের বহু পরিভাষাকোষ এবং চরিতাভিধান, ইতিহাস অভিধান, উচ্চারণ অভিধান, বানান অভিধান, প্রয়োগ অভিধান, কিংবা সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান বের করেছে সেগুলো ঐ পরিকল্পনার অংশ কিনা তাও স্পষ্ট নয়। ইদানীং একাডেমী অবশ্য অভিধানের দিকে বেশি ঝুঁকেছে এবং নানা রকমের অভিধান বের করে চলেছে। সে যাই হোক, একাডেমীকৃত শিষ্ট বাংলার ব্যবহারিক অভিধানটি কী রকম হয়েছে তা দেখা দরকার।

প্রথমে উল্লেখ করতে হয়, এইটি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত শিষ্ট বাংলার প্রথম অভিধান। সেদিক থেকে এ অভিধানের প্রকাশ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলা অভিধানের ধারায় এইটি যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন সে কথা অস্বীকার করা যাবে না কোনোভাবে। সবচাইতে বড় কথা হল এইটি বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অভিধান। সেজন্য চালু বাংলা অভিধানগুলোর চেয়ে এটি একটু স্বতন্ত্র। এ অভিধানে প্রচলিত বাংলা শব্দসম্ভার তো আছেই; উপরন্তু কবি সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত শব্দাবলিও এতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখের শব্দ, বৈষ্ণবীয় শব্দ যেমন এ অভিধানে স্থান পেয়েছে, তেমনি দৌলত উজির বাহরাম খান, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামযা প্রমুখ বিশিষ্ট মধ্যযুগীয় মুসলমান কবিদের ব্যবহৃত সাহিত্যিক শব্দাবলি, যার সিংহভাগ আরবি ফারসি শব্দ এবং যেগুলো ইতোপূর্বে প্রচলিত বাংলা অভিধানগুলোতে স্থান পায়নি, সেগুলো এ অভিধানে পাওয়া যাবে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকদের (সুধীন দত্ত, জসীমউদ্‌দীন, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, আহসান হাবীব, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ) ব্যবহৃত দেশী বিদেশী সংস্কৃত শব্দ এবং সম্প্রতিকালের বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত শব্দও এ অভিধানে নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক লেখার শব্দরাজি অভিধানে আসা উচিত এইজন্য যে, এগুলো পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।[৫] বাংলা একাডেমী *ব্যবহারিক অভিধানের* সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক হল শব্দের প্রয়োগরূপের অসংখ্য দৃষ্টান্ত, বাগ্‌বিধি ও বাক্‌রীতির অজস্র ব্যবহারিক নমুনা। প্রত্যেকটি ভুক্তির না হলেও অধিকাংশ ভুক্তির প্রয়োগরূপ এ-অভিধানে দেখানো হয়েছে। এইটিই অভিধানটির বিশিষ্টতা। প্রয়োগ দেখানোর জন্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবিকুল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের চেনা জানা খ্যাত অখ্যাত বড় ছোট প্রায় সকল কবি, গদ্যলেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক পর্যন্ত সকলের রচনা থেকে কাব্যিক চরণ কিংবা সাধু ও চলতি রীতির বাক্যবন্ধ ও সংলাপ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রয়োগ-উদ্ধৃতির কারণে অভিধানটির *ব্যবহারিক অভিধান* নামের সার্থকতা। সাহিত্যরচনা থেকে উৎকলিত ভুরি ভুরি নমুনার জন্য অভিধানটি বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ও অনুরাগীদের ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে। শব্দের প্রয়োগরূপ সংগ্রহের এত বেশি আয়োজন আমরা অন্য কোনো বাংলা অভিধানে দেখিনি। প্রয়োগের ব্যাপারে সঙ্গতভাবে কথা উঠতে পারে। অভিধানভুক্ত সব শব্দের প্রয়োগ দেখানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এমন এমন শব্দ যেগুলি অতি সাধারণ ও অতি পরিচিত, সেগুলোর প্রয়োগ দেখানোর বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। তবে শব্দের ভিন্নার্থে ও বিশিষ্টার্থে প্রয়োগরূপের তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে, এবং সেটি এ অভিধান গুরুত্ব দিয়েই দেখাতে চেয়েছে।

অভিধানটির প্রশংসার দিক এইটি। অন্য অভিধানের তুলনায় এ অভিধানে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দের ভুক্তিও বেশি। হিন্দু কবিদের মধ্যে সেকালের ভারতচন্দ্রের আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারের খ্যাতি রয়েছে। উনিশ শতকের বিশিষ্ট গদ্যশিল্পীদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিম, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এবং কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল কম বেশি আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে মুসলমান কবিদের কথা তো বলাই বাহুল্য। দোভাষী পুঁথিকারদের এবং তাঁদের অনুসারীদের ভাষারীতি অবশ্য বাংলা ভাষার স্বাভাবিকতা বিরোধী এবং অনেক সময় তা উৎকটও ; কিন্তু মধ্যযুগের খ্যাতনামা মুসলমান কবিরা যেমন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি আরবি ফারসি শব্দের সুন্দর স্বচ্ছন্দ ব্যবহারও করতে পেরেছেন। মুসলমানদের নবী-পয়গম্বরদের বৃত্তান্ত, পীর মুরশিদের সাধনা ও আধ্যাত্মিক গান, ইসলামী শাস্ত্র ও রীতিনীতি, ইসলামের ইতিহাস ও পুরা কাহিনী লিখতে গেলে আরবি ফারসি শব্দের আধিক্য ঘটার কথা। অবশ্য মীর মশাররফ হোসেন প্রচলিত পুথিকাহিনী অবলম্বনে *বিষাদ সিন্ধু* লিখলেও আরবি ফারসি শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। অন্যদিকে নজরুল ইসলাম, আবুল মনসুর আহমদ, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, শওকত ওসমান প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের ভাষারীতির একটি উজ্জ্বল দিক হল আরবি ফারসি শব্দের শিল্পিত ব্যবহার। বাংলাদেশের কবি, কথাশিল্পী ও নাট্যকারদের অনেকের প্রবণতা আরবি ফারসি শব্দ ও মৌখিক শব্দ ব্যবহারের দিকে। বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধান এ-সব শব্দ সংকলনে যে বেশি মনোযোগী হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার বাংলা ভাষায় স্বাভাবিকতা পায়নি এমন বহু আরবি ফারসি শব্দও এ অভিধানে রয়েছে। মধ্যযুগের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কবিকুলের আরবি-ফারসিসহ বহু শব্দই এখন সাহিত্যের পাতায় শুধু আছে। সুতরাং আমার মনে হয়, মধ্যযুগের সাহিত্যপাঠের সুবিধার্থে আলাদা একটি অভিধান প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যবহারিক অভিধানের ভিতরে কবি-সাহিত্যিকদের সব শব্দ নিতে গেলে অভিধানের কলেবর স্ফীত হতে থাকবে।

বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক অভিধানে, অন্য অভিধানগুলোর তুলনায়, ইংরেজি শব্দেরও ভুক্তি যে অধিক সেকথা আগে বলেছি। সাম্প্রতিক জীবনে চালু অনেক ইংরেজি শব্দই এ অভিধানে পাওয়া যাবে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক আমলে প্রশাসনের ভাষা ইংরেজি একটু একটু করে বাঙালির জীবনের ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারপর আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জবানে বসে যায়। এই উপবেশন এতই পাকাপোক্ত ও স্থায়ী যে ইংরেজরা এদেশ থেকে চলে গেলেও ইংরেজি রয়েই যায় এবং থাকবেও চিরদিন। ইংরেজরা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য হারিয়েছে বটে, কিন্তু ইংরেজি ভাষার সাম্রাজ্য মোটেও হারায়নি, বরং এটি বাড়িয়েই চলেছে।

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যবসা বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইংরেজি সমগ্র বিশ্বময় এক নম্বর ভাষা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হল এই, প্রশাসন ও শিক্ষার স্তরে ইংরেজির জোর কমেছে এবং সেজন্য ইংরেজি বোলচালে বাঙালি ব্রিটিশ আমল বা পাকিস্তানী আমলের মতো তত দড় নয়, কিন্তু তা বলে শিক্ষিত বাঙালির জবান থেকে ইংরেজি শব্দ মোটেও খসে যায় নি। সমাজের উচ্চবিত্ত স্তরে ইংরেজি তো রয়েছে, তাছাড়া সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির মুখ থেকেও যে এক আধটা ইংরেজি শব্দ আহেল বেরিয়ে পড়ে সে কথা সত্য। বাংলা বাক্যবন্ধের মধ্যে দু'একটা ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত লেখাপড়া জানা বাঙালি। আধুনিক বিদ্যা ও বিত্ত বাংলাদেশের শিক্ষিত নাগরিক মানুষের চিন্তা, চৈতন্য, সাধ-আকাঙ্ক্ষা, ভোগ, বিনোদন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জীবন পরিচর্যায় আন্তর্জাতিকতার প্রভাব দিন দিন বাড়িয়ে চলেছে, তাই আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজির অনেক শব্দ আধুনিক জীবনকে ঘিরে থাকবে। আমরা শহরবাসীরা আধুনিক জীবনকে তৈরি করেছি ইংরেজদের অনুকরণে। আমাদের জীবনে সেজন্য ইংরেজি শব্দ সর্বক্ষণ ঘোরাফেরা করে। বাইরের বিস্তৃত জীবনের কথা বাদই দিলাম, ঘরের মধ্যেই না কত ইংরেজি শব্দ নিয়ে আমরা আছি!— ড্রয়িং রুম, চেয়ার, টেবিল, সোফা, কার্পেট, ম্যাট, টব, ক্যালেণ্ডার, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, এ্যাশ-ট্রে, ডাইনিং টেবিল, কাপ, প্লেট, গ্লাস, জগ, মগ, কেতলি, ট্রে, ডিশ, ফ্রিজ, ব্রেড, বাটার, জ্যাম, জেলি, পোচ, ওমলেট, মামলেট, স্যুপ, রোস্ট, চপ, আইসক্রিম, কিচেন, মিটশেফ ও ফ্রাইপ্যান, ফ্লাক্স, ওয়াটার টাব, টিফিন বক্স, বেড রুম, ওয়াডরোব, হ্যাঙ্গার, চেস্ট অব ড্রয়ার, বেডশিট, প্যান্ট, শার্ট, জোট, জ্যাকেট, আন্ডারওয়ার, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার, স্যুট, স্যান্ডেল, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, শোকেস, ব্যাগ, মানিব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, ড্রেসিং টেবিল, পাউডার, স্নো, ক্রিম, লিপস্টিক, নেল পলিশ, আই লাইনার, বিউটি বক্স, হেয়ার স্প্রে, বাথরুম, টাওয়াল, শাওয়ার, ফ্লাশ, কমোড, ওয়াশিং মেশিন, সোপকেস, টুথ পেস্ট, টুথব্রাশ, শেভিং মেশিন, ব্লেড, শেভিং ক্রিম, শেভিং ব্রাশ, আফটার শেভ লোশন, সেন্ট, রিডিং রুম, বুক শেলফ, পেন্‌সিল, ফাউন্টেন পেন, বল পয়েন্ট, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, কারেন্ট, লাইট, ফ্যান, বাল্‌ব্‌, সুইচ, মিটার, হিটার, স্টোভ, ওয়াল ক্লক, রিস্টওয়াচ, চর্চ, ব্যাটারি, ক্যামেরা, গ্রামোফোন, টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট, ফটো, ফটোস্ট্যান্ড, এলবাম ইত্যাদি। আপাতত এই শব্দগুলো স্মরণে এল, খুঁজলে হয়তো আরো পাওয়া যাবে। ঘরের তালিকা যেখানে এত দীর্ঘ, সেখানে বাইরের জীবনে আমরা যে শত শত ইংরেজি শব্দ নিয়ে চলছি তা তো সত্য। এই ইংরেজি শব্দগুলো আন্তর্জাতিক শব্দ, আবার ওগুলো বাংলা শব্দ হয়েও দাঁড়িয়েছে। ওগুলোর দুই একটার বাংলা পরিভাষা হলেও ওগুলো ঠিক চলে না, বরং মূলরূপে সেগুলো আমাদের ব্যবহারে এসে গেছে।

সুতরাং বাংলা অভিধানে যে ঐ শব্দগুলোর জায়গা থাকবে তা বলা বাহুল্য। আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে অধিকতর যোগাযোগের ফলে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুবাদে আরো বহু আন্তর্জাতিক তথা ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করছে। বাংলা একাডেমী *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* এই বাস্তবতার দিকে সচেতন থেকে সাম্প্রতিক ইংরেজি শব্দগুলোও অভিধানভুক্ত করেছে। তবে এটি বলা ঠিক হবে না যে, উপরিউক্ত শব্দগুলোর সব এই অভিধানে পাওয়া যাবে। ফ্যান, ফ্রিজ, মিটশেফ, ওয়াড্রোব, ক্যাসেট, ব্লেড, আন্ডারওয়ার, ব্রেসিয়ার, স্নো, ক্রিম ইত্যাদি পরিচিত বহু শব্দ এ অভিধানে পাইনি। অন্যদিকে বাংলায় স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি এমন অনেক ইংরেজি শব্দ এ অভিধানে আছে। আরবি ফারসি শব্দের ক্ষেত্রেও এরকম আমরা দেখেছি। অবশ্য এ ব্যাপারে অভিধানের একটি অংশের সম্পাদক আগেই বলে রেখেছেন যে, সাম্প্রতিক সাহিত্যে যেহেতু এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সেজন্য স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হোক বা না হোক এগুলো অভিধানভুক্ত করা সমীচীন মনে করেছেন তিনি [মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৭৪ : —]। বাঙালির জবানে ও বাঙালির রচিত সাহিত্যে ব্যবহৃত সব ইংরেজি শব্দ অভিধানভুক্ত হওয়া উচিত কিনা সেটি অবশ্য বিচারসাপেক্ষ ব্যাপার; কিন্তু সেটি করতে গেলে অভিধানে কুলোবে বলে মনে হয় না, কেননা আজকাল সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বিনোদন, বাণিজ্যিক পত্রিকা, ও প্রচার-মাধ্যমের ভাষায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজির বেপরোয়া মিশেল ঘটছে এবং সাহিত্যের ভাষায়ও তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে। যাহোক, বাংলা একাডেমী *ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে* অধিভুক্ত কিছু শব্দ বাংলা হরফে লেখা হলেও এগুলো ইংরেজি শব্দই, বাংলা হয়ে ওঠেনি। যেমন— অপসন (option), অ্যাটিচিউড (attitude), ইকুটি (equity), ইণ্ডাইটমেন্ট (inditement), ইনলাইটেন (enligtened), ইনসমনিয়া (insomnia), ইনসলভেন্ট (insolvent), এগজিকিউটার (executor), এবলিশ (abolish) এসেসর (assessor), এসকর্ট (escort), কার্দিয়াল (cordial), কার্নিভাল (carnival), ক্রিয়েটিভিটি (creativity), চার্ম (charm), জার্নি (journey), ট্রান্সপোর্টেশন (Transportation), ট্রেসপাস (trespass), ডিপোজিশন (deposition), ডিফেন্ড (defend), ডিরেল (derail), ডায়ার্কি (dyarchy), ডিসট্যান্ট (distant), ডিসেন্ট (decent), ডিসচার্জ (discharge), থ্রু (through), রিক্রুটিং (recruiting), ফোমেন্ট (foment), বম্বার্ড (bombard), বুলভার (boulevard), ভাম্পায়ার (vampire) ইত্যাদি।

উনিশ শতক থেকেই বাঙালি গদ্যলেখক, কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকারেরা তাদের রচনার মধ্যে বাক্যে, বর্ণনায় ও সংলাপে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে আসছেন। কিন্তু এ শব্দগুলোর মধ্যে কোন্ কোনটি বাংলা অভিধানে থাকবে তা নিয়ে এ গ্রন্থ সব সময় যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করে নি। একজন লেখক একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার

করলেই সেটি অভিধানে নিয়ে আসা হয়েছে। ফলে ডব্লিউ-টি (W.T) অর্থাৎ Without Ticket এর মতো হাস্যকর ভুক্তিও এ অভিধানে হয়েছে। 'থ্রু' সম্পর্কেও একই কথা। ভারমুথ (Vermouth) মদের নাম দিতে গেলে বিয়ার, শ্যাম্পেন, ভদকা ইত্যাদি মদের নামও দিতে হয়। এ অভিধানে ওগুলো না থাকলেও হুইস্কি, ব্রাণ্ডি আছে। বোঝা যায়, এ অভিধানের শব্দসংগ্রাহকেরা বেশ পরিশ্রমী, কিন্তু সবসময় বুদ্ধিদীপ্ত নন। দু'একটি শব্দের পরিভাষা নিয়েও কথা উঠতে পারে। যেমন— Chancellor ও Vice-Chancellor কে করা হয়েছে মহাধ্যক্ষ ও উপ-মহাধ্যক্ষ। কিন্তু এই মহারথীদ্বয় বাংলা ভাষায় আচার্য ও উপাচার্য নামে পরিচিত। আচার্য চলে না, উপাচার্য একরকম চলছে— তবে এই দুই পরিচিত ইংরেজি শব্দ মূল রূপেই প্রতিদিন উচ্চারিত হয়।

এই অভিধান যে পূর্ববঙ্গীয় অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত বহু চালু শব্দ শুধু এ অভিধানেই পাওয়া যাবে, *চলন্তিকায়* বা *সংসদে* এ-সব শব্দ আমরা দেখিনি— যেমন হায়াত, মওত, রিজিক, কলেমা, আজরাইল, জিব্রাইল, জানাজা, দাফন, জাকাত, জায়নামাজ, মাজার, খোৎবা, মুসল্লী, মুসলমানী (খৎনা অর্থে), মেহমান, গরবা, মেজবানি, দুলহা, দুলহান ইত্যাদি। পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে মুসলমান পরিবারে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির নাম যা বর্তমান শহরবাসী প্রজন্মের কাছে একেবারে অপরিচিত— যেমন খোরা, দস্তরখান, ধোচনা, সফ (বড় পাটি বা মাদুর), ইত্যাদি এবং আরো বহু লৌকিক ও মৌখিক শব্দ এ অভিধানকে ভিন্ন স্বাদ দিয়েছে। এ অভিধান বিশেষ বিশেষ শব্দের পর্যায় শব্দগুলোও দিয়েছে এবং শব্দের বিশিষ্টার্থক রূপগুলোও দিয়েছে। প্রয়োগ রূপ দেখানোর প্রতি বিশেষ মনোযোগের কারণে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়নি, কিংবা প্রকৃতি প্রত্যয় আলাদা করা হয়নি; শুধু সংকেত দিয়ে শব্দের পদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বানানে প্রধানত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে, এবং আরবি ফারসি শব্দসহ অন্যান্য শব্দের যত বানান বৈচিত্র্য আছে যেমন অজু/অজু; ইন্তিকাল/এন্তেকাল, ফেসাদ/ফ্যাসাদ, ছালন/ছালুন/সালন; শোধরান/শোধরানো/শুধরান/শুধরানো/শুধরন/শুধরনো; গ্রেপ্তার/গ্রেফতার/গ্রেফ্‌তার/গিরিফ্‌তার/গেরেফতার/গেরেপ্তার/গেরেফ্‌তার ইত্যাদি সব কথ্যভঙ্গির রূপ দেখানো হয়েছে। এ অভিধানে অন্যান্য বাংলা অভিধানের মতো ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষার তালিকা থাকার কারণ নেই; যেহেতু বাংলা একাডেমী বিভিন্ন সময়ে পরিভাষা-কোষগুলো বের করছে। পরিশিষ্টে ধ্বনি ও যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য অভিধান-ব্যবহারকারীদের সহায়ক হবে।

ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের বৈশিষ্ট্য বিচারে প্রধানত ভাষার চলমান রূপবৈশিষ্ট্য এবং ছোট আকৃতি ও সুবহতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেই দিক থেকে 'বাংলা একাডেমী *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*কে ঐ ধরনের ব্যবহারিক অভিধান বলা যাবে না। কারণ, এ অভিধানে অনেক অচলিত মধ্যযুগীয় শব্দের ভুক্তি তো রয়েছেই, তাছাড়া রয়াল সাইজের প্রতি পৃষ্ঠা তিন কলামে ছাপা প্রায় সোয়া এগার শ' পৃষ্ঠার এই অভিধান বেশ বড় আকৃতির ও ওজনের বৃহৎ গ্রন্থ। এটি যত্রতত্র বহনযোগ্য নয়। সে জন্য সুবহ এবং সকল কাজের ও সবসময় সঙ্গে রাখার উপযোগী একটি ছোট অভিধানের প্রয়োজন হল। বাংলা একাডেমী এই প্রয়োজন সারাল ঐ বড় ব্যবহারিক অভিধানটিকে কেটে ছেঁটে ছোট করে অর্থাৎ অসংখ্য ভুক্তি কমিয়ে দিয়ে এবং শব্দের প্রয়োগ রূপ না দেখিয়ে। এই অভিধানের নাম *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাজ্ঞ অধ্যাপক এবং দেশের প্রখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর আহমদ শরীফ এই অভিধানের সম্পাদক। ভুক্তিনির্বাচন ও সম্পাদনার কাজে তাঁকে সাহায্য করেন বাংলা একাডেমীর শামসুজ্জামান খান প্রমুখ কয়েকজন কর্মকর্তা। এই অভিধানের প্রথম প্রকাশ ১৯৯২ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ হয় অতি সম্প্রতি অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে। অভিধানটি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানগুলোর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ও সবচেয়ে ছোট। বাংলা একাডেমীর বর্তমান মহাপরিচালক মনসুর মুসার দেওয়া হিসেবে জানা যায় এই অভিধানের প্রথম সংস্করণের ভুক্তি সংখ্যা ১৭৭৫৮, আর দ্বিতীয় সংস্করণে ভুক্তি সংখ্যা ১৯৮৫২ (দ্র. দ্বিতীয় সংস্করণের 'প্রসঙ্গ কথা')। অর্থাৎ দুই হাজারেরও অধিক ভুক্তি সাম্প্রতিক সংস্করণে রয়েছে। চলন্তিকা অর্থাৎ চলমান অভিধানের এইটিই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। চলন্তিকা তো চলছেই, এটি বসে থাকে না। সময়কে ধারণ করে এ অভিধান ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত অভিধানটির এই গুণ রয়েছে। এই অভিধানের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ডক্টর শরীফ জানাচ্ছেন :

> আমরা এ অভিধান সাধারণ শিক্ষিত জিজ্ঞাসুর জন্যে শব্দের বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ জিজ্ঞাসা মেটানোর লক্ষ্যে তৈরি করেছি। ভাষাবিজ্ঞানীর চাহিদা মতো শব্দের গঠনগত , বাক্যে প্রয়োগগত ব্যাকরণ এবং বাগর্থগত বিশ্লেষণ এতে মিলবে না, আবার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-জাতীয় অভিধানও এটি নয়। বাংলা একাডেমী সংকলিত অভিধান 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'-এর এটি একটি সর্বার্থে সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। তবু এ অভিধানে কিছু বিরলপ্রযুক্ত সংস্কৃত শব্দ বাদ দেওয়া হয়নি কিংবা যায়নি, আর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের লেখকদের প্রবণতার ও প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মৌখিক উপভাষায় ও লেখ্য ভাষায় বহুল ব্যবহৃত আরবি-ফারসি-ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার শব্দগুলো সযত্ন সংকলনে প্রয়াসী হয়েছি। এ সব শব্দের অধিকাংশ সুবল

মিত্রের, আশুতোষ দেবের, যোগেশচন্দ্র রায়ের, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, রাজশেখর বসুর কিংবা শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের এমন কি আবদুল ওদুদের অভিধানেও মেলে না [আহমদ শরীফ ১৯৯২ : নয়]।

বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান যে পশ্চিমবঙ্গীয় ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের তুলনায় একটু ভিন্ন রকম সে কথা সত্য। এ অভিধান অনেক অচলিত সংস্কৃত ও আরবি ফারসি শব্দ বর্জন করেছে; অন্যদিকে মৌখিক বাংলার অনেক শব্দ এবং ব্যবহারিক জীবনে চালু আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দ এ অভিধানটির সম্পদ। সর্বকনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে এ অভিধানে বেশ কিছু নতুন শব্দেরও ভুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, শিল্পবাণিজ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর সেসব শব্দ। কম্পিউটার, ডিস এন্টেনা ইত্যাদি শব্দ এ অভিধানে প্রথম দেখলাম; অন্যদিকে একুশে ফেব্রুয়ারি, শহীদ মিনার, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিবাহিনী, রাজাকার ইত্যাদি জাতীয় জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলিও এই অভিধানে স্থান পেয়েছে। অনেক নতুন পারিভাষিক শব্দেরও ভুক্তি হয়েছে এ অভিধানে। যেমন— অবমুক্তি, অর্থায়ন, উপনির্বাচন, জোটনিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, তৃতীয় বিশ্ব, দূতাবাস, যানজট, শিল্পোদ্যোগ ইত্যাদি। আবার কুলখানি, গ্যাঞ্জাম, বোরহানি, স্যান্ডুইচ-এর মতো শব্দ এ অভিধানকে ভিন্ন স্বাদ দিয়েছে। অবশ্য এ অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণে ভুক্তি হিসেবে কতগুলি চালু শব্দ আমি পাইনি, যেমন—আদমব্যাপারী, উপজেলা, উপসচিব, এনজিও, ক্যালকুলেটর, ক্যাসেট, ক্লিনিক, চেহলাম, জন্মনিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা, টেনিস, টেবিল, তৃণমূল, দরপত্র, পরাবাস্তব, বনায়ন, বর্ষপঞ্জি, বাগর্থ, মন্ত্রণালয়, শ্রদ্ধাঞ্জলি, সচিবালয়, সমন্বয়কারী, কার্ডফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইত্যাদি। মনে হয়, কোনো কারণে এসব শব্দ ভুক্তি-নির্বাচকদের চোখ এড়িয়ে গেছে। অবশ্য শেষোক্ত শব্দ তিনটি একেবারে সদ্য আগত; আগামীতে নিশ্চয়ই এগুলো অভিধানভুক্ত হবে।

বাংলা একাডেমীর *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* শব্দের বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণে ভুক্তির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অন্য অভিধানগুলোর তুলনায় বেশি দিয়েছি। সব শব্দের না হলেও এ অভিধান দরকার মতো কোনো কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়েছে, কখনো কখনো সমাসবদ্ধ ও প্রত্যয় উপসর্গ নিষ্পন্ন শব্দ ভেঙেও দেখিয়েছে। আর সংকেত দিয়ে শব্দের পদপরিচয় সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। বিশিষ্টার্থক শব্দের ও প্রাবাদিক বাক্যবন্ধের যে সব ভুক্তি এ অভিধানে রয়েছে তা ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। বানানে বাংলা একাডেমী প্রণীত ১৯৯২-এর বানান বিধি অনুসৃত হয়েছে। শুরুতে নির্দেশিকা থাকায় অভিধানটি ব্যবহার করতেও সুবিধের হয়েছে। এ অভিধান সম্পূর্ণ নয়, নিখুঁত নয়; কিন্তু এ

অভিধান যে সর্বাংশে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এও সত্য যে, এ অভিধানটি চলমান সাম্প্রতিক জীবনের ভাষিক পরিচর্যার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এ অভিধানটি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানগুলোর মধ্যে অনায়াসে উল্লেখযোগ্যতা দাবি করতে পারে। শুধু বাংলাদেশে নয়, সকল বাংলাভাষী অঞ্চলে এ অভিধানেরও ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।।

টীকা

১. অভিধান পর্যায়ের কাজ রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন তা হল কিছু ইংরেজি শব্দের বাংলাকরণ, সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে সেগুলি চয়িত। বাংলা ও ইংরেজি বর্ণানুক্রমিক তালিকায় সেগুলো সাজিয়েছেন। দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯১ : ৩৬১-৪০৬, ৪৪৫-৪৭৭]।

২. ক. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য : *বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়* (১৯৭৩)।

খ. হাবীবুর রশীদ : *বাংলা অভিধানের কথা,* (১৩৭০)।

গ. অমলেন্দু ঘোষ : *অভিধান ও কোষগ্রন্থ,* (১৯৮১)।

ঘ. হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত) : *বাংলা ভাষা,* (১৯৮৪-৮৫)।

ঙ. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : *অভিধান* (১৯৮৭)।

৩. মধুচন্দ্রের চেয়ে মধুচন্দ্রিমাই বেশি প্রচলিত। এরকম একটি মধুর শব্দের ভুক্তি *চলন্তিকা ব্যবহারিক শব্দকোষ* কোন অভিধানে নেই। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধানেও* নেই। 'মধুচন্দ্রিকা' আছে।

৪. এ প্রসঙ্গে স্বরবর্ণ অংশের সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য : বলাবাহুল্য, বাংলাদেশে এই শ্রেণীর লেখক ও সাহিত্যিকদের লেখা পঠিত, সমালোচিত ও পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। — 'ভূমিকা' দ্র:।

গ্রন্থপঞ্জি

অমলেন্দু ঘোষ
১৯৮১
'অভিধান ও কোষগ্রন্থ', *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। (চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্)। কলকাতা।

অমলেন্দু সেন
১৮৮০
বিশ্বভারতী পত্রিকা। কলকাতা।

আহমদ শরীফ	*সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।
১৯৯২	
কাজী আবদুল ওদুদ	*ব্যবহারিক শব্দকোষ*। কলকাতা।
[ও অনিল চন্দ্র ঘোষ]	
১৯৬৭	
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'বাঙ্গালা ভাষা' *বিবিধ প্রবন্ধ*, ২য় খণ্ড। কলকাতা।
১৩৮৪ বঙ্গাব্দ	
মুহম্মদ এনামুল হক (সম্)	*ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, স্বরবর্ণ অংশ। ঢাকা : বাংলা
১৯৭৪	একাডেমী।
১৯৭৬	*মনীষা মঞ্জুষা* ২য় খণ্ড। ঢাকা : মুক্তধারা।
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম	*অভিধান*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।
১৯৮৭	
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	*বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়*। কলকাতা।
১৯৭০	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*বাংলা শব্দতত্ত্ব*। কলকাতা : বিশ্বভারতী।
১৩৯১	
রাজশেখর বসু	
১৩৬৩	*বিচিন্তা*। কলকাতা
১৩৮৬	'সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা', *লঘুগুরু*। কলকাতা
১৩৫৮	*চলন্তিকা*। কলকাতা।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	'শব্দ কথা', *রামেন্দ্র রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড। কলকাতা।
১৩৫৬ বঙ্গাব্দ	

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ি (সম্)
১৯৯২ ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস
১৯৮৮ *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*। কলকাতা : সাহিত্য সংসদ।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন
১৩৬৪ 'বাংলা অভিধান', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষা। ঢাকা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩৩৭ 'অভিধান', *প্রবাসী* : আশ্বিন। কলকাতা।

হাবীবুর রশীদ
১৩৭০ 'বাংলা অভিধানের কথা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* : গ্রীষ্ম সংখ্যা। ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (সম্)
১৯৮৪ *বাঙলা ভাষা*, প্রথম খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।
১৯৮৫ *বাঙলা ভাষা*, দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।